সর্বযুগের বিশ্বস্ত নবী

[বাংলা]

কামাল উদ্দিন মোল্লা

সম্পাদনা : চৌধুরী আবুল কালাম আজাদ

1431 – 2010

islamhouse.com

النبي الأمين صلى الله عليه وسلم

[اللغة البنغالية]

كمال الدين ملا

مراجعة : أبو الكلام أزاد

1431 - 2010

islamhouse.com

সর্বযুগের বিশ্বস্ত নবী

ইসলাম শূন্য পৃথিবী :

ইসলামের আগমন পূর্বকালে সমগ্র মানবতা নিপতিত ছিল ভয়াবহ দুরবস্থায়। এমন এক অন্ধকার বিরাজ করছিল; যেখানে আলোর প্রভা ছিল একেবারেই অনুপস্থিত।

শুধু একক আরব উপ-দ্বীপ নয়, বরং তৎকালিন সময় সমগ্র পৃথিবীই জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।

দুই পরাশক্তি- রোম এবং পারস্য তৎকালিন দুনিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল শাসন করত। উভয়ের ছিল ¯Zš ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা সংস্কৃতি। তবে এ সভ্যতার মানদন্ড কি? এবং কোন ধরণের চিন্তা চেতনা, মানসিকতা, ও আধ্যাতিকতার ভিত্তিতে তাদের সভ্যতা সংস্কৃতিতে মানুষ বসবাস করতো তা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

পারস্যঃ কিসরা ছিল শাসক (কিসরা: প্রাচীন পারস্য সম্রাটের উপাধি)। তবে তিনি প্রচলিত অর্থের রাজা ছিলেন না; ছিলেন ইলাহ বা উপাস্য।

তার প্রতি অভিবাদন ও সম্মান প্রদর্শন করা ছিল আল্লাহর উপাসনার মত। ফটকের পর ফটক পার হয়ে তার সামনে উপস্থিত হতে হতো। আর যখনই তার সম্মুখে কোনভাবে উপস্থিত হওয়া যেত তখনই সেজদায় লুটিয়ে পড়তে হতো। এবং অনুমোতি না পেলে মাথা উঁচু করা ছিল অসম্ভাব।

আরজি পেশের পূর্বে অনিচ্ছা সত্তেও এক গুচ্ছ প্রশংসা, বিনয় ও আন্তরিকতা প্রকাশের মাধ্যমে করতে হতো।

প্রাসাদ হতে অতিক্রম কালে কিসরা প্রাসাদ কে পৃষ্ঠ দিয়ে আসা ছিল একেবারেই অসম্ভব। কিসরার চোখের আঁড়ালে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সামনে মুখ করেই চলতে হতো। কারণ, তথাকথিত এই মাবুদ কে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ছিল প্রজাদের জন্য জঘন্য অপরাধ। একে কিসরার মর্যাদা হানি এবং তার সম্মানের পরিপন্থী মনে করা হতো।

বস্তুতঃ মানুষ এই তথাকথিত মাবুদের কাছে কৃতদাস বলে গন্য হতো। যে ব্যক্তিই হোক তার জীবন- যাপন ছিল কিসরার অনুগ্রহ নির্ভর অথবা যুগ যুগ ধরে চলে আসা কিসরাদের প্রচলিত আইনের অন্ধনুকরণ করে জীবন যাপন।

সল্প সংখ্যক লোক- রাজ্যের সুখ, আরাম, আয়েশ উপভোগ করতো। তারা হলো কিসরার অমাত্যবর্গ- যারা সাধারনের উপর শাসন করতো কিসরার সাথে একযোগে। এ ছাড়া বিরাট জন গোষ্ঠী অভাব- অনটন, জুলুম- নির্যাতন ও অমানবিক জীবন যাপন করতে হতো।

কারণে অকারণে তাদের যুদ্ধ বিগ্রহে বাধ্য করা হতো এবং এ সকল যুদ্ধে অসংখ্য নিরীহ মানুষ নির্ভর যোগ্য কোন কারণ ছাড়াই জীবন বলি দিতেন এবং যারা বেঁচে থাকতেন তারাও গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকতেন এবং অসহনীয় যন্ত্রণা য় জীবন যাপন করতেন।

বড়ত্বও ঐতিহ্যের মহরত এবং জৌলুসের দৃশ্য তা শুধু কিসরার প্রাসাদ এবং প্রাসাদের সাথে সংশ্লিষ্ট মধ্যসত্ত ভোগীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । সাধারণের কোন মূল্যই ছিল না এই প্রাসাদে। যতটুকু আদর তা শুধু শাসক ও নেতৃবৃন্দের ¯^‡_। তাতেও তথা কথিত মাবুদের ¯^_ সবার আগে বিবেচ্য হতো। হ্যাঁ শিল্প কলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতির উন্নতি হয়েছে। তবে এ সব কিছু কিসরা, রাজন্য ও অমাত্যগণের কল্যাণের বাহিরে ব্যবহার হতো না।

জাতীয় উপাসনা ছিল আগুন পূজা। আগুন যাতে চিরন্তন প্রজ্জলিত থাকে তার জন্য সারাক্ষণ সজাগ থাকতো গণক, পুরোহিতগণ। কারণ আগুন নিভে যাওয়া সিংহাসনে আসীন সম্রাটের জন্য অশুভ লক্ষণ হিসেবে

বিবেচিত হতো। আখলাক বা নৈতিকতা তাতো বিধবস্ত এবং ভেংগে চুরমার। কমিউনিজমের প্রসারে ‡¯'˜QvPwi Zv, বিসৃঙ্খলা, ধ্বংস ছড়িয়ে পড়ে ছিল। এই সে সভ্যতা যে খানে আত্মিক, মানবিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক এক মহা বিপর্যয় ঘটেছিল।

রোমান সম্রাজ্যের অবস্থা এর ব্যতিক্রম নয়। কায়সার বা সিজার তিনি (প্রাচীন রোমক সম্রাটের উপাধি) ও আরাম–আয়েশ ভোগ বিলাস জৌলুসপূর্ণ আলোক বেষ্টনীতে থাকতেন। যেমন টি ছিল কিসরা। শাসক শ্রেণীর জৌলুসপূর্ণ জীবনের বিপরীতে, জন সাধারণ শাসক শাসিতের শ্রেণী বৈষম্য, মূর্খতা, ভ্রষ্টতা, অজ্ঞতাও দু:খ দূরদশার মধ্যে জীবন যাপন করতো। সাধারণের কাজ হতো নেতৃবৃন্দের ¯^v‡_, নিজের ¯^v_ বলতে কিছু ছিল না। যুদ্ধ বিগ্রহ যা উসকে দিত সিজার এবং তার রাজন্যবর্গ সেটা আর শেষ হতো না। লাখো বনি আদম এ জন্য জীবন দিতে বাধ্য হতো। কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধ? কি জন্য বলি দান? কি সেই যুক্তি যার জন্য এ লড়াই? কি সে বিশেষত্ব যার জন্য এ রক্ত? কোন উত্তর তাদের জানা ছিল না।

মূলত এসব হতো সমরাজ্যবাদী সিজার ও তার নেতৃবৃন্দের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, অধিকতর গৌরব প্রকাশ, বিজয় অর্জন ও দাস বানানো। অসম্মান করা, দমন করার ইচছা, যা ছিল এক জংগলী বর্বরতা, যেখানে কোন আইনি শাসন ছিল অকল্পনীয়। এখানেও শিল্প কলা, বিজ্ঞান– প্রযুক্তি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন ছিল; তবে তা শাসক শ্রেণীর দখলে থাকতো।

এ সম্রাজ্যের ধর্ম বিশ্বাস ছিল জাহেলী পৌত্তলিকতা। ধর্মের কর্তা ও রক্ষক গির্জা এবং রিজালুদ্দীন বা পোপ–পাদ্রি। আল্লাহ হলো তিন উপাস্যের মধ্যে তৃতীয়। নাউযু বিল্লাহ । যিশু (ইসা আ:) আল্লাহর সন্তান। ধর্মীয় পন্ডিত, বিশপ–সন্যাসী ছিল আধ্যাত্মিকও ধর্মীয় জগতের শাসক, তাদের শাসন নীতি ছিল ঐশী বিধানের পরিবর্তে নিজেদের তৈরী মনগড়া নীতি, তারা অন্যায়ভাবে জনগণের সম্পদ ভোগ করতো। একই সময় সিজারও রাষ্ট্র শাসন করতো মনগড়া জাহেলী রোমান–গ্রীক আইন দিয়ে; আল্লহর বিধানের সেখানে কোন স্থান ছিলনা। জনগণ ত্রিমুখী শক্তি– সিজার এবং তার নেতৃবর্গ অন্য দিকে পোপ–পাদ্রী বিশপদের জুলুম অত্যাচার নির্যাতনে মরি বাচি দিন কাটাতো।

উল্লেখিত দুই সাম্রাজ্যের বাহিরে এশিয়ায় হিন্দু সভ্যতা ও চীন সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। হিন্দুস্থানেও অন্য জাতির মত শ্রেণী বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। তবে এর নিয়ম অন্যরকম। যেমন : শূদ্র শ্রেণী তাদের সৃষ্টি আল্লাহর পা থেকে। এ জন্য এরা হলো নিচু এবং অপবিত্র শ্রেণী। যত রকমের লাঞ্জনা অপমান জিল্লতি তারা সহ্য করবে। এটা তাদের নিয়তি। আত্মা পূনর্জন্মের মাধ্যমে এ থেকে তাদের মুক্তির পথও এটাই। অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের জন্য মানুষের এই আত্মা। মৃত্যুর পর এ আত্মা নতুন সত্তা বা ব্যক্তির মধ্যে চলে যায়। এ নিয়তি এবং বিশ্বস নিয়ে যদি শূদ্র শ্রেণী লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অপমান, কষ্ট এবং জাতীয় অপবিত্রতা কে মেনে নেয়, তবে কখনো বা তাদের আত্মা তাদের চেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তির মধ্যে স্থানান্তর হতে পারে । অর্থ্যাৎ তারা কিছুটা জাতে উঠতে বা ক্ষয়িত্র বা বৈশ্য শ্রেণীতে উন্নিত হতে পারবে।কিন্তু কস্মিন কালেও মনিব শ্রেণী; ব্রাক্ষণ হতে পারবে না। যাদের সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর মাথা অথবা হাত হতে। এর মধ্য দিয়ে শূদ্র বা দাস শ্রেণী কাঙ্খিত মুক্তির তৃপ্তি লাভ করল মাত্র। এখানে আছে অসংখ্য উপাসনা আরাধনার প্রথা। স্রষ্টার সংখ্যাও অনেক। তবে সবই হলো ভ্রান্ত। আর্শ্চযের বিষয় হলো দেবতার নৈকট্য লাভের আশায় মন্দিরে বেশ্যা বৃত্তি

করা– এতে মূলত শয়তানের নৈকট্য লাভ হয়। গাভীর পূজা, গাভীর গোবরে গড়াগড়ি দেওয়া, মঙ্গলের জন্যে তার পেশাব দিয়ে স্নান করা ইত্যাদিও তাদের উপাসনা বলে গন্য।

গাভীর যদি বাক শক্তি থাকতো তবে তার আরাধনাকারীদের সে অবশ্যই উপহাস করত, বিস্ময় প্রকাশ করে বলতো সেরা এই জাতি কেন এ ইতর কাজে রাজি হলো?

পৃথিবীর এক প্রান্তের বিশাল দেশ চীন, যার শাসনক্ষমতা ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে। তৎকালিন সময়ের সম্রাটের মত তিনি ও ছিলেন সম্মানিত। প্রচলিত প্রথায় তার জন্য উপাসনা এবং উপঢৌকন পেশ করা হতো। তার সামনে মস্তক অবনত করত। অধিবাসীদের উপাস্য হল গৌতম বৌদ্ধ। তার প্রতিকৃতি তৈরি করে সে মুর্তির পূজা হতো। বৌদ্ধ ধর্মে ও হিন্দু ধর্মের মত মানব দেহের অবমূল্যায়ন হতো। আত্মার মুক্তির জন্য দেহের উপর জুলুম কারা হতো। দুনিয়াকে গুরুত্বহীন মনে করে সন্ন্যাসী জীবন তারা গ্রহন করত অমর জীবন লাভের আশায়। এ জীবন কোথায়? কি তার আকৃতি– এ হলো অমরত্ব গ্রহন গৌতম বৌদ্ধর সাথে কাল্পনিক জগতে। এখানে জ্ঞান বিজ্ঞান অর্থ বিত্তের উন্নতি হয়ে ছিল তবে সব কিছু অকেজ। কারণ প্রকৃত স্রষ্টাকে ভুলে তারা নিজেরাই অকেজো হয়ে পড়েছিল।

আরব উপদ্বীপ তাতো জাহেলী অন্ধকারে ডুবে ছিল। সামাজিক ভিন্নতার কারনে জাহিলীয়াতের বাহ্যিক আকৃতি, সভ্যতার মান ভিন্ন রকম ছিল বটে, কিন্তু মূল জাহিলিয়াত ছিল অভিন্ন। আরবের জাহেলিয়াত হলো শিরক বা অংশিবাদ। মনগড়া বিধান, মনবীয় কাল্পনিক নিয়ম–নীতির শাসন। আরব উপ–দ্বীপে তিনটি সমপ্রদায়ের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তবে সবগুলো ভ্রান্ত।

(১) ইয়াহুদী: তাদের দৃঢ় অবস্থান ছিল মদীনা এবং তার আশ পাশ এলাকায়। তারা তাদের পবিত্র কিতাব তাওরাতে বিকৃতি করে আসছে যুগ যুগ ধরে। আল্লাহর শরীয়তের পরিবর্তে মিথ্যার অনুপ্রবেশ এবং পূর্বেকার বাপদাদাদের রসম রেওয়াজ দিয়ে পূর্ণ করে ছিল আসমানি কিতাব। এক সময় তারা বাপ–দাদাদের রসোম রেওয়াজকে ও বাদ দিয়ে তাদের মনগড়া রীতি নীতিকেই বিধান বানালো। মূলত আল্লাহর পরিবর্তে তারা শয়তানের পূজা করত।

(২) নাসারা: ভ্রান্ত কয়টি খ্রীষ্টান উপদল তারা তাদের পথ ভ্রষ্টতা নিয়ে বিদ্যমান ছিল। ত্রিত্ববাদের আবিস্কার করল। ঈসা (আ:) আল্লাহর সমকক্ষ এবং আল্লাহর সন্তান মনে করে তার এবাদত করত।

(৩) আরবের মূর্তি পূজারি সমপ্রদায়: জাজিরাতু আরবের সর্বত্র কম– বেশি তাদের উপস্থিতি ছিল। তারা মূর্তি পূজা করত,

এবং আল্লাহর পবিত্র ঘর কাবাতে মূর্তি স্থাপন করত। অথচ আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় রাসূল ইব্রাহিম এবং ইসমাইল আলাইহিমাস সালাম কে এ পবিত্র ঘর নির্মানের জন্য আদেশ করে ছিলেন; যাতে এ ঘরে শিরক মুক্ত একমাত্র আল্লাহর এবাদত হয়। এই সেই স্থান যেখানে আল্লাহর নবী ইব্রাহিম দোয়া করে ছিলেন:

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آَمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿35﴾ سورة إبراهيم

(হে প্রতিপালক তুমি এ শহর কে নিরাপদময় কর, আমাকে এবং আমার বংশধরদের কে মূর্তি পূজা থেকে রক্ষা কর।)

এতকিছুর পরও তারা বলত তারা দ্বিনে ইব্রাহিমের উপর চলছে।

তাদের মাথায় কতক রূপ কথার জন্ম হয়ে ছিল। তারা বলত ফেরেস্তারা হলেন আল্লাহর কন্যা। এবং এরাও উপাস্য। জিন জাতিরও আল্লাহর সাথে বংশীয় সম্পর্ক আছে এ জন্য তারা তাদেরও পূজা করত। আর মূর্তি তারা নিজেরাই তৈরী করত ও তার উপাসনা করতো।

এবং বলতো

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (الزمر:3)

অর্থ: আমরা এ জন্য তাদের এবাদত করি যেন তারা আমাদের কে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।

কুরাইশ গোত্র আরবের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ন্ত্রন করতো। তারা তাদের কে আল্লাহর ঘর উলঙ্গ তাওয়াফ করতে আদেশ করতো। নিষিদ্ধ মাস (শাওয়াল, জুলক্বদাহ, যুলহাজ ও মুহাররাম) গুলোতে যুদ্ধ করাকে বৈধ ঘোষণা দিয়ে ইচ্ছেমত সময় বৃদ্ধি করে; ঐ বর্ধিত সময়কে নিষিদ্ধ মাস বলে ঘোষণা করতো। মৃত জন্ত জানোয়ার খাওয়া কে বৈধ মনে করতো। ইচ্ছেমত কোন হালাল বস্তুকে হারাম বলে ঘোষণা করতো। আরবরা এ ভূয়া শরিয়তের আনুগত্য করত। আর আল্লাহর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ করতো। কন্যা সন্তানদের জীবন্ত ফুঁতে ফেলতো, নারীদের অপমান করতো, তাদের উপর জুলুম করতো। মদ্যপান করতো, জুয়া, ব্যাভিচারীকেও বৈধ মনে করতো। লুট-পাট চুরি-ডাকাতি খুন-খারাবি মদ জয়া ইত্যদিতে তাদের জীবন অতিবাহিত হতো। কতিপয় সমপ্রদায় যেমন কোরাইশ, ছাক্বিফ, হুয়াজিন তারা কখনো ব্যবসা করতো কখনো বা সুদী কারবার করতো। অন্য সময় অলস সময় কাটতো। এক কথায় আরব সমাজও ধবংস এবং বরবাদিতে নিমজ্জিত ছিল।

রিসালতে মুহাম্মদীর পূর্বে পৃথিবীর এই ছিল হাল। শিরক এবং জাহিলিয়াতে সয়লাব ছিল, পৃথিবীতে নূন্যতম আলোর আশাও ছিল ক্ষীণ। এই অবস্থায় আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেন মুহাম্মদ বিন আব্দিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ।

ইব্রাহিমের দুয়া, ঈসার সুসংবাদ, নবী জননীর ¯C :

أنا دعوت أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت. (اخرجه أحمد البزار' الطبراني ألحاكم البيهقي

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আমি আমার পিতামহ ইব্রাহিমের দুয়া, এবং ঈসা (আ) এর সুসংবাদএবং আমার মা যে ¯C দেখেছেন তারই ফল।

ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দুয়া (একটু পূর্বে ইংগিত করা হয়েছে) তার বর্ণনা কুরআনুল কারীমেও এসেছে।

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿127﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿128﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿129﴾ البقرة

অর্থ: যখন ইব্রাহিম ও ইসমাঈল কাবা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল তারা দুয়া করে ছিল: প্রভূ! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী সর্বজ্ঞ। প্রভূ! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকে ওএকটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী দয়ালু। হেপ্রভূ! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসুল

প্রেরণ করুণ– যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদের কিতাব এবং হেকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।

ঈসা আলাইহিস সালাম এর সুসংবাদ– যাহা কুরআন মাজিদে অর্ন্তভূক্ত হয়েছে।

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿6﴾ الصف

অর্থ: যখন মরিয়ম তনয় ঈসা (আ) বলল : হে বনী ইস্রাঈল আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আগমন করবেন তার নাম আহমাদ। অত:পর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল তখন তারা বলল : এ তো এক প্রকাশ্য যাদু।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আম্মা আমেনার ¯^c

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, আমেনা বলল : আমার গর্ভ ধারণের বয়স যখন ছয় মাস হলো। ¯^c দেখি একজন লোক এসে আমাকে বলল : হে আমেনা তুমি জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে গর্ভে ধারণ করেছ, প্রসবের পর তার নাম রাখবে মুহাম্মদ, এবং এ বিষয়টি গোপন রাখবে।

এভাবেই দোয়া, সুসংবাদ ও ¯^‡ci মিল যেন পূর্ব দিগন্তে কতগুলো উজ্জল নক্ষত্রের সম্মিলন ঘটল। এবং এ সবই এক মাত্র ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেন্দ্র করেই হচ্ছে অথচ তিনি এখনো অদৃশ্য। এরই মধ্যে তার আবির্ভাব ঘটল এবং পৃথিবীতে আলোর বিকিরণ শুরু হলো।

তাওরাত ও ইঞ্জিলের সুসংবাদ

ইয়াহুদী এবং খ্রীষ্টানদের হাতে তাওরাত ও ইনজীলে বিকৃতি হওয়ার পরও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের সুভাগমন সম্পর্কে অনেক বর্ণণা পাওয়া যায়। এ বিষয় তাওরাত ও ইঞ্জিলের দুইটি বর্ণনা পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে।

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الأعراف:157)

অর্থ: সে সমস্ত লোক যারা আনুগত্য Aej¤b করে এ রাসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী যার সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদের নিদের্শ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে, তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্ত সমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তার উপর ঈমান এনেছে তার সহচর্য Aej¤b করেছ তাকে সাহায্য করেছে এবং সে নুরের অনুসরনণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ

شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿29﴾ الفتح

মুহাম্মদ আল্লাহ রাসূল এবং তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদের রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মূখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমনএকটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অর্ন্তজ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরুস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।

ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়, ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে এ সব স্পষ্ট ইঙ্গিত মুছে ফেলে ছিল, তবে সব ধবংস করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাওরাতের আদি এক ভলিয়ম যা সিনাই পর্বত অঞ্চলের সানক্যাটরিন আশ্রমে পাওয়া গিয়াছিল (১৩৬৫হিজরী মোতাবেক১৯৪৫ইং) তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্ম্পকে স্পষ্ট বর্ণনা উল্লেখ ছিল। অত:পর এ ভলিয়ম হারিয়ে গেল আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে মদীনার ইয়াহুদী সমপ্রদায় আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়কে বলত:নবীর আগমনের সময় হয়েছে তার সাথে থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা বিজয় হব। এ বর্ণনার দিকে পবিত্র কুরআনে ও ইংগিত দেয়া হয়েছে।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿89﴾ البقرة

অর্থ: যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌছাল যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্ব হতে কাফিরদের নিকট বর্ণনা করত । অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌছল যাকে তারা চিনে রেখে ছিল তখন তারা তা A¯^xKvi করে বসল। অতএব A¯^xKviKvix‡`i উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

তারা আউস ও খাযরাজদেরকে উল্লেখিত কথাগুলো কল্পনাপ্রসূত বলত না বরং তারা তাওরাতের সেই বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করেই কথাগুলো বলতো। এতে করে বুঝা যায় তাওরাতের আদি ভলিয়ম গুলোতে শুধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম ও বৈশিষ্ট্যি উল্লেখ রয়েছে তা নয়, বরং তাতে রাসুল আগমনের স্থান ও সম্ভাব্য সময়ের বর্ণনা ছিল। যার উপর নির্ভর করে ইয়াহুদী সম্প্রদায় রাসূলের আগমনে আগ্রহী হয়ে উঠে। এও বলা যায় তাদের বিকৃতি সত্তেও তাওরাতে বর্ণির্ত ছিল, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন জায়গায় নবুয়ত লাভ করবেন এবং কোন স্থানে হিজরত করবেন যা তারা জানতো।

খৃষ্টান সম্প্রদায় ঈসা (আ) কে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার কিছু কাল পর যখন ইঞ্জিল লিপিবদ্ধ করল তখন তাতে পরিবর্তন করল। এর পর যখনেই কোন ভাষায় অনুবাদ হতো তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমের আলোচনা খুব অস্পষ্টভাবে করত, এর পরও ইঞ্জিলে ঈসা (আ) এর উদ্ধৃতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের ইংগিত পাওয়া যায়। তা হলো:

(سيأتي من بعدي الفار اقليط)وفي بعض النسخ يضاف إلى هذه العبارة(من لا استحق أن أحمل سيور حذائه(

(আমার পর আহমদ নামক এক জন নবী আসবেন) কোন ভলিয়মে উল্লেখ আছে (যার জুতার ফিতা খোলার যোগ্যতা ও আমি রাখিনা) মূলত এ বাক্য দ্বারা আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালাম তার বিনয়ী প্রমাণ করেছেন।

তাঁর বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আরো এসেছে يملأ الأرض نورًا وعدلاً তিনি আলো এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবী ভরে দিবেন। ঈঞ্জিলের অন্য ভলিয়মে বর্ণিত হয়েছে–

يوبخ العالم على خطيئته ويعلم الناس جميع الحق لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع من عندالله

অপরাধের জন্য আলেমদের তিনি তিরস্কার করবেন এবং মানুষকে সকল প্রকার ন্যায় ইনসাফ সততা শিক্ষা দিবেন। কারণ তিনি নিজের থেকে কোন কথা বা মন্তব্য করেন না। বরং আল্লাহর নিকট হতে যা শুনেন তাই শুধু বলেন।

এর অর্থ হচ্ছে তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। আল্লাহ তাঁর নিকট প্রত্যাদেশ পাঠান। ঈঞ্জিলের এই পূর্বাবাস পর প্রায় দুই হাজার বছর অতিক্রম হলো মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ ছাড়া এ পর্যন্ত আর কোন নবীর আগমন হয়নি এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ আসবেও না। তার সম্পর্কেই ঈঞ্জিলের ভিতর الــــفار اقليط শব্দ দিয়ে ইংগিত করা হয়েছে।

الــــفار اقليط শব্দটি ইউনানী শব্দ যার অর্থ। الحمد বা প্রশংসা এটা احمــد শব্দের কাছাকাছি যে আহমদ শব্দের সু–সংবাদ আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) এর ভাষায় পবিত্র কুরআনের সূরা সাফ্‌ফ ছয় b¤^i আয়াতেও এসেছে।

মূসা এবং ঈসা আলাইহিমাস সালাম তাদের অনুসারীদের মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সাথে সাথেই তাঁর রিসালতের প্রতি ঈমান আনার জন্য আদেশ করেছিলেন। আল্লাহর সাথেকৃত অঙ্গীকার ও আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নার্থে।

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿آل عمران:81 ﴾

আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান। অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন সে রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে। তিনি বললেন তোমরা কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তারা বললো আমরা অঙ্গীকার করছি। তিনি বললেন তাহলে এবার সাক্ষী থাক । আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।

অথচ তারা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রসূত তাদের নবী রাসূলদের এ আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿البقرة:109﴾

অর্থঃ আহলে কিতাবের অনেকেই প্রতিহিংসা বশত: চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোন রকমে কাফির বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)। যাক তোমরা

আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

﴿ الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ البقرة: 146

আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সমপ্রদায় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে।

নবুয়াত পূর্বে রাসূল (সঃ) এর গুনাবলী ও অবস্থান

আল্লাহ তাআলা রাসূলদের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ থেকে নির্বাচন করে থাকেন। আর রাসূল (সঃ) সৃষ্টি ও নবীগণ উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

রাসূলগণ নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে এবং এ সম্পর্কে মানুষের প্রতিক্ষা ও অনুভূতির আগেই আল্লাহ তাআলা তাদের সংশোধন, হেফাজত ও তত্ত্বাবধান করেন যাতে যখন তাদের প্রেরণ করবেন তারা আধ্যাত্বিক মানসিক চারিত্রিক ও দৈহিকভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে উঠেন নবুয়তী কাজ আল্লাহর মর্জি মোতাবেক বাস্তবায়ন করার জন্য।

এটা মানুষ ¯vfweK অবস্থায় বুঝতে পারেননা, যদিও আল্লাহ তাআলা জানেন– ইনি হবেন তার রাসূল। তবে মানুষ তাঁর ¯Zš বৈশিষ্ট্য দ্বারা তা অনুভব ও অনুমান করে থাকে। কখনো বলে থাকে এই ব্যক্তি এক সময় বড় কিছু হবে। আর এটা রাসূল (সঃ) এর ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে, যা অন্য নবী রাসূলদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

আমরা বলবোনা এসব বিষয় নবী জননী আমেনার জানাছিল। কারণ তিনি যা জেনেছেন তা তাকে দেখানো ¯c থেকে তিনি জেনেছেন। একথাও বলবোনা নবীজীর চাচা আবু তালেব এবং দাদা আব্দুল মোত্তালেব তা জানতেন। যতটুকু অনুমান হয়েছে তার সাথে গভীর সংশ্লিষ্টতার কারণে হয়েছে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের কারণে কুরাইশদের অনুমান হয়েছিল। যেমনটি হতো প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির যে তাকে একবারের জন্য দেখতে পেতেন। ব্যবসায়ীক যাত্রাপথে, আল্লাহর ঘর তাওয়াফরত অবস্থায় অথবা বন্ধ মহলে চুপ চাপ বসে থাকা অবস্থায়। তার বৈশিষ্ট্য ছিল যৌবনের প্রথম দিক থেকেই একজন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ধীরস্থির সম্মানিত মহান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। তার উপলব্ধি ছিল একজন কামেল মানুষের উপলব্ধি।

জাহিলিয়াত যুগ, ফিৎনা ফাসাদ ও আমোদ–প্রমোদে ভরপুর ছিল। যদিও কাদাচিৎ বয়স্কদের মাঝে কিছু সম্মানিত ব্যক্তির উপস্থিতি ছিল; কিন্তু যুবকের মাঝে তা ছিল অকল্পনীয়। যে যুবক জাহিলি কর্মকান্ডে অংশ না নেয়া ছিল আশ্চর্যজনক। সেখানে তাদের মাঝে গভীর চিন্তায় নিমগ্নতা, ধীরস্থিরতা, মদের আড্ডাখানায় অনুপস্থিতি আশা করা– যা বৃদ্ধ লোকের কাছেও আশা করা যায়না, তাদের মুখ থেকে জাহিলিয়াতের মুখোশ উঠিয়ে নেয়া, যেখানে এসব করাই হচ্ছে সামাজিক রীতি নীতি। আল্লাহর ঘরের পাশে রক্ষিত মূর্তির কাছে না যাওয়া অথচ মূর্তির কাছে যাওয়াটা সকলের নিকট গৌরবের বিষয় এবং এটিই হচ্ছে উপাসনার বস্তু। জুলুম অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকা সেই জাহেলী যুগে যে যুগের কবির কবিতায় আসে

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه ** يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم

যে রক্ষা করেনা আপন কূপ নিজের তরবারি দ্বারা তবে তা ধ্বংস করা হবে ** আর যে মানুষের উপর অত্যাচার না করবে তার উপর অত্যাচার করা হবে।

এর পরও যদি ভালো বৈশিষ্ট্যের আশা করা হয় যুবক থেকে তাহলে বলবো আপনি চোখ কান বুঝে অন্য কোন গ্রহে বসবাস করছেন। কারণ যেখানে কোন বয় বৃদ্ধ ব্যক্তির মাঝে এই গুনাবলী অনুপস্থিত সেখানে যুবকের কাছে আসা করছেন।

অন্যদিকে রাসূলকে দেখুন রাসুল (সঃ) এর গুনাবলী থেকে একটি গুন যা গভীরে পৌছে ছিল এবং বিকাশ লাভ করেছিল সকল কুরাইশের দৃষ্টি গোচরও হয়েছিল তা হলো আমানত দারী। এমনকি সকলে তাকে আল– আমিন উপাধিতে ভূষিত করলেন। জনগণ তার কাছে তাদের ধন সম্পদ গচ্ছিত রাখতেন আস্থা ও তার আমনত দারীতে বিশ্বাসী হয়ে। যা চাচা আবু তালেবের সাথে ব্যবসায়ীক কাজেও প্রকাশ পেয়েছিল। যেখানে জাহিলি ব্যবসা ধোঁকা প্রতারণা ও তীব্র লালসা থেকে মুক্ত ছিলনা।

কুরাইশদের মজলিশে তিনি থাকতেন নীরব। যখন ¯ie হতেন; কথা বলতেন যুক্তিযুক্ত ও সকলের কাছে গ্রহনীয় ও পান্ডিত্যপূর্ণ যা কুরাইশদের আত্মায় নাড়া দিতো। এবং তাদের সম্মান, মূল্যায়ন রক্ষা হতো। ফলে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরামর্শ চাইতেন যেমন পরামর্শ চাইতে হয় একজন বৃদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে। এবং তার দেওয়া সিদ্ধান্তে সকলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করতো। পরামর্শ চাওয়ার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য একটি হলো হজরে আসওয়াদ স্থাপনে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কাআবা শরীফের দেয়ালে ফাটল, কোনো কোনো জায়গাতে পাথর খসে পড়া, বর্তমানের চেয়ে আরো উঁচু করা ইত্যাদি কাজ করার লক্ষে কাবার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর কুরাইশরা সবাই একমত পোষন করে সকলের সহযোগীতায় কাজও শুরু করল। কিন্তু হাজরে আসওয়াদ পূণঃস্থাপন করতে এসেই তাদের ভিতর অনৈক্য বিতর্ক এমন কি লড়াই বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হলো। চারদিন পর্যন্ত এই বিতর্ক ঝগড়া চলতে থাকে কোন সমাধান নাই। প্রত্যেক গোত্র একাই হাজরে আসওয়াদ পূনঃস্থাপনের গৌরব গ্রহণ করতে চায়। শেষ পর্যন্ত সকলে একমত হলো। যে, সকলের আগে আল্লাহর ঘরে আসবে তার সিদ্ধান্ত সবাই গ্রহণ করবে। আল্লাহর ইচ্ছায় ঐদিন প্রথম আগমন কারী ব্যক্তিটি হলেন তাদের পরিচিত আল– আমিন। অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাই এটাকে খুব ভালো দৃষ্টিতে দেখলো এবং তারা আল আমিন এর বিচারক হওয়ায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করল। এইভেবে যে তার নিকট ঝগড়া নিস্পত্তির সঠিক সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে এবং সংকট দূর হবে। বাস্তবে তাই হয়েছে। তিনি তার চাদরটি বিছিয়ে দিলেন। বললেন প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধি চাদরের এক এক প্রান্তে ধরবে। সবাই তাই করল আর তিনি তার পবিত্র হস্তে পাথরটি উঠিয়ে চাদরের মাঝখানে রাখলেন, বললেন সবাই মিলে যেখানে স্থাপন করা হবে ঐ জায়গাতে নিয়ে যান। তাই করল। অতঃপর পাথরটি প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পবিত্র হাতে পূর্বস্থানে পুনঃস্থাপন করেন। এই ভাবে সবাই গৌরবময় কাজে অংশ গ্রহণ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পবিত্র হাতে পাথর তার আপন জায়গাতে স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিষয়টি নিস্পত্তি হয়। সবাই সাদিকুল আমিনের ফায়সালায় খুশি হন।

খাদিজা বিনতে খুয়াইলাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অহীর আকস্মিকতায় জড়িয়ে ধরে তার বৈশিষ্ট্যকে এভাবে চিত্রায়িত করেছেন।

كلاّ والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلّ وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نواصب الحق (البخاري.3ومسلم 231

আল্লাহ আপনাকে কখনো বিপর্যস্ত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধনকে সু–দৃঢ় করেন। আপনি সত্যকথা বলেন। আপনি পরের দুঃখ ভার বহন করেন। আপনি কাঙ্গালের সেবক– আপনজন। আপনি অতিথি পরায়ন। আপনি মজলুমের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। বুখারী, মুসলিম।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরব অবস্থায় চিন্তা করতেন, ধ্যান করতেন। তার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি বছরে একমাস জনমানুষ থেকে দূরে থেকে হেরা গুহাতে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এবাদত বন্দীগি করতেন ঈব্রাহীম আলাইহিস সালামের ধর্মানুযায়ী। এড়িয়ে চলতেন ঐ সকল কাজ কর্ম যা ধর্মের নামে দ্বীনে ইব্রাহিমে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

মূলত: আল্লাহ তায়ালা তাকে এসব কিছুর মাধ্যমে মহান এক কাজের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। তাহলো নবুয়তের জিম্মাদারী যা দিয়ে তাকে প্রেরণ করা হবে মানব জাতির কল্যাণে।

সন্দেহাতীত এক জীবন চরিত।

ইসলামের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি হলো ইসলাম তার মূলনীতি নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃতি থাকবে। আল্লাহ নিজে ইসলামকে হেফাজত করবেন এবং পৃথিবীর সকল ধর্মের উপর তাকে বিজয়ী দান করবেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (الصف 9)

তিনিই তার রসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তার বিশেষ ক্ষমতায় কুরআনকে হেফাজত করেছেন। আল্লাহ বলেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿الحجر:9﴾

অর্থ: আমিই এই কুরআন অবতির্ণ করেছি এবং আমিই এর রক্ষক।

এমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাদীসকে হিফাজতের মাধ্যমে হেফাজত করেছেন তার জীবন–চরিতকেও। যার ফলে অন্য নবী রাসূলদের জীবনীর মত প্রিয় রাসূলের জীবনী হারিয়ে কিংবা নষ্ট হয়নি এবং তার মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন ও বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেনি। যেমন অনুপ্রবেশ হয়েছে বনী ইস্রাঈলের নবীদের জীবন–চরিতে। মূসা আ. হতে ঈসা আ. পর্যন্ত। তারা যার নাম দিয়েছে, আল কিতাবুল মুকাদ্দাস বা العهد القديم والعهد الجديد বাইবেলের নতুন টেষ্টামেন্ট এবং পুরাতন টেষ্টামেন্ট যা করা হয়েছিল তাওরাত ও ইঞ্জীলের বিপরীতে।

যে পুরাতন টেষ্টামেন্ট পড়বে সে বুঝতে পারবে তাতে Awm¤qv আলাইহিমুস সালামের চরিত্রে কতটা কদর্যতা লেপন করা হয়েছে (তাদের জাল চরিত্র রচনা করার মাধ্যমে) অশ্লীলতার মিথ্যা অপবাদ দানের মাধ্যমে। যা একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়, থাকতো নবী রাসূল?। আল্লাহর জমিনে এমন কোন অপবাদ ও অপকর্ম নেই যা অন্যায়ভাবে তারা ঐ সকল নবী রাসূলদের কুৎসা রটনায় ব্যবহার করেনি। হত্যা, চুরি,জবর দখল, লুণ্ঠন ধোকাবাজী, মিথ্যা, চারিত্রিক দুস্কর্ম। আশ্চর্যের বস্তু হলো এসব লেখেছে ঐ সব লোক যারা তাদের উম্মত। মহান আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন–

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿البقرة:93﴾

বলে দিন, তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকলে তোমাদের সে ঈমান তোমাদেরকে মন্দ বিষয়াদিরই আদেশ করে থাকে

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿البقرة:79 ﴾

অতএব তাদের জন্যে আফসোস যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্যে এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে।

তারা Aww¤qv আলাইহিমুস সালামের জীবন চরিত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করেছে। বিশ্ববাসীর কাছে তাদের নোংরা আঁচরণ নির্দোষ প্রমান ও গোপন করার জন্য। যদি তাদের নবীগণ এমন অপকর্ম করে থাকেন যেগুলো তারা বলছে তাহলে যারা তাদের অনুসারী তারা কি এসব অপকর্ম করেনি? ইঞ্জিলের বিভিন্ন ভলিয়মে ঈসা আলাইহিস সালামের চরিত্র কলঙ্কিত করা সম্পর্কে যদি বলেন; সেখানে তো কোন জালিয়তি বা বিকৃতি হয়নি। তাহলে বলবো ঈসা আ. কে প্রভুর আসনে বসানো ও আল্লাহর সন্তান বলে দাবী করা কি জগন্যতম জালিয়াতি নয়?

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿88﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿89﴾ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿90﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿91﴾ مريم

অর্থ: তারা বলে দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয় তোমরাতো এক অদ্ভুত কান্ড করেছ। হয়তো এর কারণেই এখনই নভোমন্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হবে এবং পর্বতমালা চুর্ণ- বিচূর্ণ হবে। একারণে যে, তারা আল্লাহর জন্যে সন্তান আহ্বান করে।

এ হলো পূর্বেকার Aww¤qv আ. এর জীবন-চরিত যাতে ভূল তথ্য অথবা বিকৃতি সংঘটিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীকে আল্লাহ তাআলা ভুল ও অমুলক হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন এবং এমন এক অসাধারণ উম্মতের নিকট তার জীবনী রক্ষার দায়িত্ব অর্পন করেছেন যাদের আমানত ও দ্বীনদারীর দৃষ্টান্ত পৃথিবীবাসী পেশ করতে আজও অক্ষম। ফলে তারা মূল সূত্রসহ তার জীবনীর বিবরণ পরিপূর্ণ হেফাজত করেছেন। এতে করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী যুগ যুগ ধরে অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন- চরিত সকল জীবন চরিতের চেয়ে নির্ভূল, নির্ভেজাল সন্দেহাতীত। যার সকল ঘটনা, বিবরণ, সূত্র গ্রহনীয়।

তার জীবনীর Av‡iKwU বৈশিষ্ট্য হলো- তার জীবনীর সূত্রে এবং কুরআনুল করীমের মাধ্যমে পূর্বেকার Aww¤qv আ. এর জীবনীরও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ রক্ষিত হয়েছে। অতএব Aww¤qv আ. এর জীবনীর যতুটুকু নির্ভরতা আজো আছে তা শুধু কোরআন ও হাদীসের বর্ণনায় আসার কারণে। আজকে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী পড়ছি অথচ এর বাঁকে বাঁকে পড়ে নিচ্ছি সকল নবী রাসূলদের জীবনী। বলা যায় পূর্বেকার নবী রাসুলদের বিক্ষিপ্ত অগোছানো জীবনী রাসূলের মাধ্যমে আমরা সাজানো গোছানো পাচ্ছি। যাতে পাওয়া যায় তাদের তাওহীদ, রহমত, হিকমত, সবর, আদলসহ উত্তম চরিত্রের বিবরণ।

ইনসানে কামিল:

নিঃসন্দেহে বলা যায় মানব জাতির ইতিহাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সবার সেরা, শুধু তাই নয়; যেসব শ্রেষ্ঠ ব্যাক্তিত্ব পৃথিবীতে আগমন করেছেন তাদের সকলের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ এমনকি নবী রাসুলদের মধ্যেও তিনি শ্রেষ্ঠ।

যদি রাজনৈতিক মানদন্ডে তাঁকে মূল্যায়ন করি তাহলে দেখতে পাবো তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে গিয়ে এমন একজাতির নেতৃত্ব কাঁধে নিলেন। যে জাতি ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, অনৈক্য, লক্ষ্যহীন, ও

বর্বর। তিনি তার যোগ্য নেতৃত্বে অকল্পনীয় কার্য ক্ষমতার বলে এই জাতির মধ্যে ঐক্য একতা, অভিন্ন লক্ষ্য উদ্দেশ্য, মুহাব্বত মমতাবোধ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে তারা ভুলে গিয়েছে অতীতের সকল পঙ্কিলতা। অতঃপর তাদেরকে নিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অগ্রসর হন। সে খানেও সম্মানের সাথে সকল গোষ্ঠী শ্রেণীর মধ্যে তাদের আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাহলে আমরা কি তাকে رجل عظيم gnvb ব্যক্তিত্ব বলবো না? তিনি কি শুধু এ দায়িত্বই পালন করেছেন ? কেমন হবে যদি সফল রাজনীতি হয় তার জীবনের অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দিকমাত্র। এবং যারা শুধু রাজনীতিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী তাদের সকলে মধ্যে তিনি হয়েছেন সবার সেরা।

একজন সমাজ সংস্কারক যদি আমরা পাই যিনি তার সমাজে পেয়েছেন মুর্খতা, সামাজিক কুসংস্কার, লাগামহীন অসভ্যতা, যেখানে ছিল দাম্ভিকতা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, ¯^_ciZ^ সামাজিক প্রতীক, সবলরা জুলুম করতো দূর্বলের উপর, ধনী ভোগ করতো গরিবের সম্পদ, সামাজিক ঐক্য একতা বলতে কোন কিছু ছিলনা। হানাহানি চলতো ক্ষমতা, পদ, আর সম্পদ নিয়ে। সুযোগ সন্ধান করতো এসবের জন্য। একে অপরের অধীকারের কোন তোয়াক্কা করতো না। ছিলনা কোন দায়িত্ববোধ। তিনি শপথ নিলেন সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, কুসংস্কার দূর করার।আবিস্কার করলেন ভারসাম্যের– ব্যক্তি ও সমাজে শাসক ও শাসিতের মাঝে। জাতির ধনিক শ্রেনীর হৃদয় সৃষ্টি করলেন গরীবদের জন্য সহমর্মিতা তাদের সম্পদে গরীবদের করলেন অংশীদার, সমাজের সবাই যেন এক পরিবারের সদস্য। একে অপরের দায়িত্বশীল, সহযোগীও সহমর্মী। এরপরও আমরা তাকে মহান ব্যক্তি বলবনা?

আমরা যদি দেখতে চাই একজন নীতিবান ব্যক্তিত্বকে যিনি তার সমাজে দেখতে পান চারিত্রিক অধপতন, মিথ্যা, কপটতা, ধোকা, প্রতারণা, লুটফাট, মদ, ব্যাভিচার, জুয়া, খুন–খারাবী, ডাকাতি, ব্যক্তি তার নিজের উপরও আস্থাশীল নয়। বাহুবল না থাকলে আপন অধিকার আদায় হয় না। প্রাপক যদি দূর্বল হয় তাকে গিলে ফেলে যেমন নেকড়ে তার শিকারকে গিলে। এই চরিত্র সংশোধন করা যদি ঐ অসাধারণ ব্যক্তির অগনিত বৈশিষ্ট্যের একটি অংশ হয়; তখন তার সম্পর্কে আমরা কি মন্তব্য করবো। তাকে কি আমরা মহান নীতি সংস্কারক বলবো না। আবার ইতিহাসে যারা শুধু চরিত্রনীতি সংস্কারে জীবন অতিবাহিত করেছেন তাদের মধ্যেও তিনি যদি হয় সবার সেরা ব্যক্তি?

এমন একজন অভিভাবক যদি পাই যিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন একটি শিক্ষিত জাতি গড়ার। আপন প্রতিজ্ঞায় তিনি সফলও হয়েছেন। এমন এক জাতি গড়েছেন যাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আপন কর্মক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। উত্তম আদর্শ– চরিত্রে ও আচরণে। ব্যক্তিত্বে সুদৃঢ়– এমন সুদৃঢ় যে প্রবৃত্তি তাকে খেল তামাশা করতে অথবা কোনো নেশা তাঁকে আন্দোলিত করতে পারে না। তারা পাহাড়ের মত স্থীর। চলমান বিশ্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পোষণকারী ও কর্মক্ষম। তারা ব্যক্তিত্বে ও মহান। এ কাফেলার সবাই তার সঞ্চালণে এক সাথে নড়ে উঠতো। কেমন হবে যদি এ হয় তার অনেক গুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি মাত্র দিক। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ক্ষেত্রেও ইতিহাসের সকল শ্রেষ্ঠ অভিভাবককে ছাড়িয়ে গেছেন। ঐ প্রজন্ম দ্বারা যাদের তিনি প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্বাবধান করেছিলেন। ফলে ঐ প্রজন্ম হতে প্রত্যেকেই অর্জন করেছিল আপন আপন ক্ষেত্রে মানবীয় গুনাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য সমূহ। এরপরও আমরা তাকে মহান ব্যক্তি বলবো না?

এমন এক সেনা প্রধান যদি পাই যিনি আত্ম নিয়োগ করেছেন সৈনিকের পেছনে আর গড়ে তোললেন এমন এক বিশাল সৈন্য বাহিনী যাদের প্রত্যেকেই সীপাহী ও সেনা প্রধান উভয় ক্ষেত্রে সমানভাবে শ্রেষ্ঠ। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন– নিজের কাছে অপছন্দনীয় কাজে ধর্য্যের, তীব্র মূহুর্তে দৃঢ়তার, ঝুঁকিপূর্ণ সময় সাহসিকতার। তাদের নিয়ে লড়াইয়ে নিমগ্ন হতেন আর বিজয় ছিনিয়ে আনতে। তারা ভালো বাসতেন সেনা

প্রধানকে আদেশের অনুসরণ করতেন, বাস্তবায়ন করতেন তার শিক্ষার, মৃত্যুর মুখে কে আগে যাবে, তাদের মধ্যে প্রতিযোগীতা লেগে যেতো। তাদের কাম্য ছিল শাহাদাত, তা তারা খোঁজে বেড়াতো। যেন তাদের নিয়তিতে দুইটির যে কোন একটি কল্যাণ লেখা থাকতো হয়তো শাহাদাত নয়তো বা বিজয়। এমন প্রশিক্ষককে মহান বলবো না? আবার দেখি এ মহানয়ক শুধু সমর বিদ্যা শিক্ষায় তাদের শ্রেষ্ঠ করেছেন তা নয় তিনি তাদের উত্তম চরিত্রও প্রশিক্ষণ দিলেন যা লড়াইয়ের ময়দানেও ফুটে উঠতো। যে চরিত্র তারা লড়াইয়ের ভীতিকর অবস্থায়ও ভুলতেন না এবং কোন অপছন্দীয় বস্তু তাদের কে চারিত্রিক সীমারেখা থেকে বিচ্যুত করতোনা। বরং রনাঙ্গনের কঠিন তম মূহুর্তে আখলাকী নজরানা তারা পেশ করতেন শত্রু মিত্র উভয়ের জন্য– সমান ভাবে। আবারো কি বলতে বাধ্য হবো না যে তিনিই শ্রেষ্ঠ কায়েদ?

এ কায়েদের পরশ ছোঁয়ায় যুদ্ধে তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যও হতো ব্যতিক্রম। লড়াই করে বিজয় অর্জন অথবা রাজ্যের আয়োতন বৃদ্ধি বা খ্যাতি অর্জন নয়। বরং মহা পবিত্র এক লক্ষ উদ্দেশ্য অর্জনের আগ্রহে অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং উহাকেই তারা লড়াইয়ের মূল স্প্রীট, বিজয় ফলাফল, ও লাভ বলে মনে করতেন। এর জন্যই তাদের সামনে অগ্রসর হওয়া কদম ফেলা এবং এর উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন হতো তাদের লড়াইয়ের মান। এখন তাকে শুধু মহান কায়েদ বললে চলে?

কেমন হবে এ ব্যতিক্রম আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তিনি যদি হয় একমাত্র ব্যক্তি মানবীয় ইতিহাসের লড়াই জগতে। আবার এ যদি হয় তার গুনাবলীর পবিত্র জুড়ির মধ্যে এটি একটি মাত্র ক্ষুদ্র অংশ।

যদি কোন মানুষ আত্ম নিয়োগ করে বন্দেগীর জন্য এবং এর মাধ্যমে আত্মাকে সুস্থ ও ¯"() সতেজ করে তুলে। এক মূহুর্তের জন্যও সে তার প্রতিপালককে ভুলে না। ক্ষনিকের জন্য ও তার সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয় না। সারাক্ষণ হৃদয়ের যোগাযোগ থাকে প্রতিপালকের সাথে– নামাযে, কাজে কর্মে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কাজে। মানুষের সাথে বন্ধুত্বেও দায়াপরবশ, কাজে সুদক্ষ ও একনিষ্ঠ। সকল কর্মকান্ডেও বিচার কার্যে তার উপর আল্লাহ ভীতি প্রভাব বিস্তার করে। আবার যদি দেখি এই মানুষটি সক্ষম হয়েছে এক বিরাট কাফেলাকে জন্ম দিতে যাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কে নিমগ্ন থাকতে। নিয়মিত আল্লাহর স্মরণের। ফলে তারা উঠতে বসতে এমনকি ঘুম যেতে অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতো। অর্জন করেছিল পূত আত্মা। আল্লাহর উপর ঈমানেই তাদের কাজে কর্মে চিন্তা গবেষণা ও অনুভূতিতে চালিকা শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দুনিয়ার অর্থ– সম্পদ সুখ–শান্তি আরাম আয়েশের পেছনেও তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকতো আল্লাহর তাকওয়া ও সন্তুষ্টি লাভ করা।

তাহলে আমরা কি বলবোনা আত্মার জগতে এক পূত পবিত্র ও বিরল আত্মা? একই সাথে সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের মাঝেও এসব গুনাবলী রোপন করার বিরল যোগ্যতার প্রমাণও একমাত্র তার পবিত্র জীবনীতেই মিলে। যা অন্য মহা পুরুষের বেলায় অনুপস্থিত। এই সব গুলোই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যক্তিত্বের এক একটি অনু অংশ মাত্র। যে দিকগুলোর একটি প্রতিষ্ঠার জন্য যারা জীবন নিঃশেষ করেছেন তাদের সকলকেও এ ক্ষেত্রে তিনি পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজমত শুধু এ সমস্ত ব্যক্তিত্বের যোগ্যতার সম্মিলন তার মধ্যে রয়েছে তার জন্য নয়; এর চেয়ে আরো মহৎ ও বড় কারণও রয়েছে তিনি মহান হওয়ার। আর তাহলো অনেকগুলো কর্মব্যস্তয় থাকার পরও একটির কারণে অন্যটি তিনি ভুলে যান না। অন্যটির ব্যাপারে অমনোযোগী হোননা। রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণে সামরিক নেতৃত্বের ব্যাপারে অন্যমনস্ক হন না। সমাজ সংস্কারের কারণে চরিত্র সংস্কারে বেখবর হননা। আবেদের ভূমিকায় অবতির্ণ হতে গিয়ে অভিভাবকের ভূমিকা সম্পর্কে অসতর্ক হোন না। বরং এসব কিছুর মাঝেও তিনি পরিবার, স্ত্রী, সন্তান সন্ততী বিষয়ও মনোযোগী ছিলেন। তিনি ছিলেন ¯^vgx হিসাবে শ্রেষ্ঠ। পিতা হিসাবে শ্রেষ্ঠ। যদি কোন মানুষ একান্তভাবে মনোযোগী হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের মত কোন পরিবারের চাহিদা

মিটাতে, খেদমত করতে ভালোবাসতে, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে আমরা তাকে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলবোনা? অতএব যার মধ্যে সকল দিক, সকল বৈশিষ্ট্যের, সমানভাবে সম্মিলন হলো, একটির অধিকার আদায় করতে গিয়ে অন্যটির ব্যাপারে অসতর্ক হলেন না, তাকে আমরা ইনসানে আজীম ইনসানে কামেল বলবোনা?

এবাদতে পাঁ ফুলে উঠছে। এবাদতের ¯^v` উপভোগ করছেন পাঁয়ের দিকে খেয়াল নাই। আম্মাজান আয়েশা রা. তার কষ্ট দেখে মায়া লাগলো। তাকে বললেনঃ এবাদত কমিয়ে শরীরকে একটু আরাম দিন। আল্লাহ তো আপনার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব মোচন করে দিয়েছেন। উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন– أفلا أكون عبادا شكورا আমার উপর যার এতো করুনা এতো অনুগ্রহ আমি কি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কারী হবো না? এই একটি ইবাদত। এ একটি কাজে তার সাথে কেউ মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারবেনা। অন্যগুলোকে না হয় বাদ দিলাম। তো এই ইবাদত কি তার অন্য কর্মব্যস্ততায় বিগ্ন সৃষ্টি করেছে? যার কারণে রাজনীতিতে, চরিত্র সংশোধনে, জিহাদের ময়দানে, প্রশিক্ষণে, অথবা ঐ সকল মহান পুরুষ তৈয়ার করতে সময় দিতে পারেন নাই– যারা সকল ক্ষেত্রে ইতিহাসের সেরা ব্যক্তিত্ব হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন? যেমন– আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, খালিদ, ইকরামাহ, আসমা, সুমাইয়্যাহ তাদের ছাড়া আরো কত শত। রাদিয়াল্লাহু আনহুম। শপথ আল্লাহর এমনটা কখনো নয়। নিশ্চয় অনেকগুলো মহত্ব একটির চেয়ে অপরটি আরো বড় আরো মহান। যার সবকটি এই মহান ব্যক্তিত্বে, এই মহান পুরুষে, এই মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে সম্মিলন ঘটেছিল।

Av¤^qv আলাইহিমুস সালামের সাথে যদি তাকে তুলনা করি সেখানেও তিনি সেরা ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রমাণ মিলে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যক্তিত্বে সম্মিলন ঘটে ছিল ঐ সকল শ্রেষ্ঠত্ব যার এক একটি ভিন্ন ভিন্নভাবে অন্যান্য নবী রাসূলদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এসেছিল।

নূহ আ. এর শ্রেষ্ঠত্ব যদি হয় দীর্ঘ ধর্য্যের কারণে, কাউমের বিরামহীন প্রতিরোধের মধ্যেও তিনি তাওহীদের দাওয়াত দীর্ঘ সময় ধরে অবিরাম, ক্লান্তহীন ভাবে চালিয়ে ছিলেন এ জন্যে । ইব্রাহীম আ. এর শ্রেষ্ঠত্ব যদি হয় সহনশীলতা, নম্রতা, উম্মতের নিকট হক্ব পৌঁছাতে গিয়ে কোমল আচরণ, আল্লাহর আদেশের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, তার আনুগত্যের জন্য দ্রুত অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে। মুসা আ. যদি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন বিচক্ষণ নেতৃত্বের জন্য যে নেতৃত্বে সম্পৃক্ত হয়েছিল বনী ঈস্রাইল এবং তারা এ আন্দোলনে সফলও হয়ে ছিল। ফলে তারা বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল, অপদস্থ ও হীনতা থেকে ¯^vaxbZv ও সম্মানের দিকে। এবং এমন একজাতি গঠন হলো যারা পরিচালিত হতো আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী। যদি ঈসা আ. এর ¯^ZšZv অর্জন হয় আধ্যাতিকতা, নম্রতা, বিনয়তার জন্যে। যা দ্বারা বিধ্বংসী বস্তুবাদ যা সারা পৃথবীতে বিস্তৃতি লাভ করেছিল, মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে ছিলেন এক ঝাঁক শিষ্যকে (যারা হাওয়ারী হিসাবে পরিচিত) উন্নত মানের চরিত্র, আধ্যাত্মিকতা ও তাদের রাসুলের শিক্ষার আনুগত্যতার জন্য।

এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী দেখুন তার একক জীবন চরিত্রে এর সবগুলোই জমা হয়েছিল এবং এর প্রভাব ও ছিল পূর্বেকার সকল Av¤^qv আ. থেকে অনেক বেশী। এ হলো মহান আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছে হয় তাকে তিনি দান করেন। মূলত এসব ¯^Zš বৈশিষ্ট্য দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাকে সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ রিসালতের জন্য প্রস্তুত করে ছিলেন।

আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (الصف: 9)

তিনি, তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন যাতে একে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন।

وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ النساء: 113﴾

আল্লাহ আপনার প্রতি ঐশী গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুনা অসীম।

শিক্ষা কেন্দ্র :

নেককার প্রজন্ম গঠনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন– চরিত হলো একটি শিক্ষা কেন্দ্রের মত। আল্লাহ বলেন–

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾ ألاحزاب:21

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনীতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে প্রত্যেক ঐ সব উপকরণগুলো যা একজন ভালো মানুষ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয়। যার প্রতি ইসলাম আহবান করেছে এবং আল্লাহর জমিনে খেলাফত প্রতিষ্ঠা দ্বারা উদ্দেশ্যও হলো ঐ গুণাবলীর আলোকে ভালো মানুষ হওয়া। আয়েশা রা. কে প্রশ্ন করা হয়েছিল প্রিয় রাসূল স. এর আখলাক সম্পকে, উত্তরে তিনি বললেনঃ তার চরিত্র হলো আল কোরআন। অর্থ পূর্ণ এক সংক্ষিপ্ত বাক্য। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন কুরআনুল করিমের জীবন্ত দর্পন। কুরআনে যে সব দিক নির্দেশনা, আদেশ, নিষেধ, মূল্যবোধ, মূলনীতি, নৈতিকতা সব কিছু তার মাঝে বিরাজমান। কুরআন হচ্ছে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরিত আসমানী কিতাব আর রাসূল স. হচ্ছেন সেই রব্বানী প্রশিক্ষণের পূর্নাঙ্গ মডেল। এদিক থেকে রাসূল স. জীবন চরিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে সে সব উপাদানসমূহ যা আল্লাহর আনুগত্য শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়। শিক্ষনীয় যে কোন বিষয় মানুষ যদি রাসুলের জীবনীতে অনুসন্ধান করে, তবে তা মহান রাসূলের জীবনীতে সে পেতে থাকবে। সততা, আমানতদারী, তাকওয়া, গুপ্ত বা প্রকাশ্য যে কোন প্রকার বিশুদ্ধতা, আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা, আল্লাহর আহ্বানের তড়িৎ জবাব দেয়া, বীরত্ব, ধৈর্য, বিজ্ঞতা, দুনিয়া বিমূখতা, বলার দক্ষতা, উত্তম ব্যবহার, বিনম্র মেলা মেশা, হৃদ্যতা, কমলতা, প্রচেষ্টায় প্রত্যয়ী, সকল বিষয় মধ্যম পন্থা Aej¤b করা ইত্যাদি। সব কিছু । যাই হোক যদি আমরা আগ্রহী হই মুসলমানের মধ্য থেকে একটি সৎ প্রজন্ম সৃষ্টির তাহলে আমাদের দুইটি কাজ প্রয়োজন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন চরিত এর সকল দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া, অধ্যয়ন করা, গভীর মনোযোগী হয়ে গবেষণা করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিক নির্দেশনাগুলোর তাত্বিক প্রয়োগের প্রচেষ্টা চালানো ঠিক ঐ আকৃতিতে যে আকৃতিতে রাসূলের কাওলী (নির্দেশ মূলক রীতি–নীতি) ও আমলী (ব্যবহারিক রীতি–নীতি) সুন্নাত পাওয়া যায়। যদি আমরা এই তুইটি উপাদনকে যথাযথ ভাবে দাঁড় করাতে পারি, তাহলে ইসলামের এই দ্বিতীয় গোরবত বা নির্বাসন (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ইসলামের যাত্রা শুরু হয় নির্বাসনের মাধ্যমে যেভাবে শুরু হয়েছিল সে অবস্থায় আবার ফিরে যাবে। আজকের প্রেক্ষাপট রাসূলের হাদীসের সত্যতা প্রমান করে।) যা আজকে আমরা অতিক্রম করছি দূর করতে সক্ষম হবো এবং উম্মতের হারানো গৌরব ফিরে পাবে।

আমাদের উপর ফরজ যেমনিভাবে প্রথম যুগের মুসলমানগণ পবিত্র ইসলামকে নির্বাসনের হাত হতে রক্ষা করেছিল। আমরাও সকল বাধা ছিন্ন করে ইসলাম রক্ষা ও আল্লাহর জমীনে তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নির্বাসনের হাত থেকে হেফাজত করা।

কোন ব্যক্তিত্বের অনুকরণ অথবা কোন আদর্শ শিক্ষার জন্য পশ্চিম অথবা পূর্বের দিকে কৌতোহলী অনুসন্ধান আজকের দিনে ও প্রয়োজন নেই। কারণ ইসলামী শিক্ষা ও পদ্ধতির সামনে সকল মানবীয় শিক্ষাই অসম্পূর্ণ ও দূর্বল। সকল ব্যক্তিত্বই রাসূলের মোকাবেলায় শিকড়হীন হঠাৎ জেগে উঠা আগাছার মত। তাহলে বিশাল জ্ঞান ভান্ডারের মালিক হয়ে আমরা কেন ভিক্ষুক হতে যাব? আমাদের বিশ্বসেরা আদর্শ, মহা পুরুষ থাকতে কেন যাব ঐ অসাড় নেতৃত্বের অনুকরণ করতে?

আমাদের মহান রাসূলের জীবনীতে ফিরে আসতে হবে এবং রাসূলের নূরে হিদায়েতের রঙ্গে আমদের রঙ্গীন হতে হবে।

পয়গামের মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালত হচ্ছে সর্বশেষ ঐশী বার্তা ঐশী মিশন। এর মাধ্যমে মানব জাতির জন্য আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত জীবন বিধান পরিপূর্ণ হয়েছে। মানব জাতির উপর আল্লাহর নেয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة: 3)

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।

আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী সকল রিসালাতের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালত বিশেষ কয়েকটি কারণে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে:

তার রিসালত পূর্বেকার সকল রিসালতের পরিসমাপ্তি ও বাতিলকারী।

মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সকল নবী রাসুলের মধ্যে সর্বশেষ। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿الأحزاب:40 ﴾

মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নয় বরং তিনি আল্লাহ তাআলার রাসূল ও শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয় জ্ঞাত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا وأحسنه وأجمله إلا موضع اللبنة من زاوية من زواياه وجعل الناس يطوفون به ويعجبون له يقولون هلا وضعت هذه اللبـنة؟ فأنا خاتم النبيين (مسلم:4239)

আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ, একজন ব্যাক্তির মত, যে চমৎকার একটি প্রাসাদ নির্মাণ করল তবে এক কোণে একটি ইটার গাঁথনী বাকী রেখে দিল, দর্শনার্থী তার প্রসাদের বৈচিত্রময় নির্মাণ দেখে অবাক হচ্ছেন আর বলছেন যদি এই গাথুনীটি বসানো হতো কতই না সুন্দর হতো। আমি সেই ইটার গাঁথুনী আমি সর্বশেষ নবী।

তাঁর রিসালত সর্বশেষ রিসালত ও পূর্ববর্তী সকল রিসালতকে রহিতকারী:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ (ألمائدة: 48)

আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়ন কারী এবং সে গুলোর বিষয় বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।

কোরআন পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের ধর্ম বিশ্বাস কে সমর্থন করে।

فالكتب كلها تقول:إنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ـ والقرآن يقول نفس الشئ.

সকল কিতাবে আক্বিদাহ সম্পর্কে বলা হলো। নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই তিনি একক। কুরআনুল করিমও ঠিক এটাই বলে।

والكتب كلها تقول :((أعبدوا الله ما لكم من إله غيره)) والقرآن يدعو نفس الدعوة.

সকল কিতাব দাওয়াত দেয় এই বলে, আল্লাহর বন্দেগী কর তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। কুরআনুল কারীম ও এই দাওয়াতই দেয়। তবে কুরআন একই সাথে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের বিধি বিধানেরও রক্ষণা বেক্ষণকারী। এই কিতাব আল্লাহর পক্ষ হতে সর্বশেষ বাণী। এই কিতাবের বিধান মেনে চলা ফরজ। পূর্ববর্তী কিতাবের যে সব বিষয় এই কিতাবের সাথে সাংঘর্ষিক তা বর্জনীয়। নিম্নে বর্ণিত আয়াতও তাই প্রমাণ করে–

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (ألمائدة: 68)

বলে দিন, হে আহলে কিতাবগণ তোমরা কোন দ্বীনের উপর নেই, যে পর্যন্ত না তোমরা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালন কর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাও পুরোপুরী পালন না কর। এ আয়াতে তাদের কাছে অংশিদার বিহীন এক আল্লাহর বন্দেগীর মাধ্যমে তাওরাত ও ইঞ্জিল প্রতিষ্ঠার দাবী করা হয়েছে। এতে করে (ইহুদীদের দাবী উযায়ের আল্লাহর সন্তান ও খ্রীষ্টানদের দাবী ঈসা আল্লাহর সন্তান তা বাতিল দাবী বলে প্রমান হয় এবং মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ এর রিসালতের ¯^xKw…Z চাওয়া হয়। কারণ তাওরাত ও ইঞ্জিলে মুহাম্মদ এর নাম, বৈশিষ্ট্য, রেসালত প্রেরণের স্থান, হিজরতের স্থান তারা জেনেছে। অতঃপর তাদের কে বলা হয়েছে কুরআনে বর্ণিত দ্বীন ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য। কোরআন মান্য না করলে তাদের কোন দ্বীন ধর্ম আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। যা এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়।

(২) রিসালতে মুহাম্মদী পূর্ববর্তী নবীদের রিসালত বিশ্বাসের আহ্বান জানায়।

قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ ألبقرة:136﴾

তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম ইসমাইল ইসহাক ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে তৎ সমূদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তারই আনুগত্যকারী

রিসালতে মুহাম্মদীই একমাত্র রিসালত যার অনুসারীগণ পূর্বেকার সকল নবী এবং তাদের উপর অবতীর্ণ বিষয়ের বিশ্বাসী। ইয়াহুদীরা ঈসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে A¯^xKvi করে, নাসারাগণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে A¯^xKvi করে এবং শুধু ঈসা আলাইহিস সালামকে বিশ্বস করে তবে নবী হিসেবে নয় আল্লাহর সন্তান হিসাবে। এক মাত্র মুসলিম সমপ্রদায় তারা আদম নূহ হতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী রাসূলদের প্রতি ঈমান আনায়ন করে।

আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিনদের বর্ণনা এভাবে দিয়েছে–

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿3﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿4﴾ ألبقرة

যারা গায়েব বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে আর আমার দেয়া রিজিক হতে দান করে। আর বিশ্বাস করে সে সব বিষয়ের উপর যা তোমার উপর এবং তোমার পূর্ববর্তীগণের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।

এ হচ্ছে এ রিসালত ও তার অনুসারীদের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের ভাগ্যে রেখেছে পৃথিবীর নেতৃত্ব

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا (ألنور: 55)

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছে তাদের পূর্ব বর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না।

আল্লাহ তাআলা জানেন যে এই উম্মত মোখামোখী হবে বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর, এবং তাদের অধীন চলে আসবে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান সমপ্রদায়। আল্লাহর ইচ্ছা যে এই উম্মতের জন্য হবে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব–

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة:143)

এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সমপ্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানব মন্ডলীর জন্যে এবং যাতে রাসূল সাক্ষদাতা হন তোমাদের জন্যে।

তারা হবে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত শুধু তাদের জন্য নয় বরং সকল মানুষের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ(النساء: 135(

হে ঈমানদারগণ তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহর জন্য।

এ জন্য এই উম্মতকে আল্লাহ তাআলা যোগ্যতা দান করেছেন হক গ্রহণ ও মানুষের মাঝে প্রচার করার। এ যোগ্যতার মধ্য থেকে একটি হচ্ছে পূর্ববর্তী নবী গণের প্রতি অবতীর্ণ বস্তুতে বিশ্বাস স্থাপন। কারণে ঐসব ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে হক্ক ও সত্য বিধান। এতে করে এ উম্মতের হৃদয়ে তাদের ব্যাপারে কোন প্রকার সংশয় ও বিদ্ধেষ সৃষ্টি হয় না পূর্বেকার কোন জাতির ক্ষেত্রে। যেমন বিদ্ধেষ প্রকাশ তারা করেছিল এ মুসলমানদের উপর (তাদের মধ্যে খৃষ্টান ও রয়েছে)। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম ও তার উপর অবর্তীণ কুরআনের কারণে। যে কুরআন হলো পূর্ববতী সকল রিসালতকে রহিতকারী। মুসলমান কারো প্রতি বিদ্ধেষ পোষণ করে না এবং কোন বিষয় তাদের অন্তরে সংশয় ও নেই। তারা সকল রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সকল রিসালতের উপর সমান ভাবে বিশ্বাস করে। এজন্য দেখা যায় ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সমপ্রদায় মুসলিম শাসনাধীন যুগে সম্মান ও নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করেছিল। তাদের উপর কোন প্রকার জুলুম, নির্যাতন হয়নি। তার বিপরীত ইয়াহুদী খৃষ্টান শাসনাধীন এলাকাতে মুসলমানের উপর সকল প্রকার অত্যাচার নিপীড়ন চলে, তাদের সম্পদ ও ভূমি কেড়ে নেয়া হয়, তাদের কে অপমান অপদস্ত করা হয়, শত সহস্র বার নির্মল ও বিনাশের চেষ্টা করা হয়। এ জন্য ইয়াহুদীজাতি অথবা খৃষ্টান জাতি মনুষ্যজাতির নেতৃত্বের যোগ্য নয় কারণ উভয় জাতি তাদের মানসিক বিদ্ধেষ থেকে, বেরিয়ে আসতে পারেনা। আর মুসলিম জাতি এককভাবে মানব জাতির নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতা রাখে। বাস্তবে তারা বহু শতাব্দি ধরে নেতৃত্বে ছিল। কারণ তারাই এক মাত্র জাতি যারা আল্লাহ দেয়া যোগ্যতার ফলে অত্যাচার নিপীড়ণ ছাড়া আন্তরিকতার সাথে শাসন করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ(آل عمران: 110)

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যানের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশদান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।

উল্লেখিত বর্ণনা মতে প্রতিয়মান হয় যে, পূর্ববর্তী সকল রাসূল ও তাদের রেসালতের প্রতি বিশ্বাস হবে তারতম্যহীন ও বিদ্বেষ ছাড়া।

(৩) রিসালতের সার্বজনীনতা

يقول الرسول صلي الله عليه وسلم كان كل نبي قبلي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة: (متفق عليه)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমার পূর্বেকার সকল নবীদের নির্দিষ্ট করে তাদের গোত্রের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। আর আমি প্রেরিত হয়েছি সকল মানুষের নিকট

কুরআনুল করিমে এর সমর্থনে আয়াত এসেছে–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ الأنبياء: 107﴾

আমি আপনাকে সমস্ত জগতের জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছি

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿القلم:52﴾

এই কুরআন হচ্ছে বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ ¯i¦c©

আল্লাহ তাআলা বলেন–

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (الأعراف: 158)

বলুন! হে মানব সকল বিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি যার জন্য আকাশ সমূহ ও জমিন সমূহের রাজত্ব।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴿ ألمائدة: 15﴾

হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন। কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে তিনি তার মধ্য হতে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মানুষের নিকট প্রেরিত হয়েছেন তাদের মধ্যে আহলে কিতাব গণ ও আছেন। এথেকে পরিস্কার হয় যে, এ রিসালত যে দাওয়াতের দায়িত্ব বহন করছে তাহলো সকল মানুষের জন্য দাওয়াত। আল্লাহ তাআলার নিয়ম ছিল প্রত্যেক সমপ্রদায়ের কাছে পৃথক পৃথক রাসূল নিয়মিত ও অনিয়মিত ভাবে প্রেরণ করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ فاطر:24﴾

এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (ألنحل:36)

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূর প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদে থাক।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى (ألمؤمنون: 44)

এরপর আমি একাধিকক্রমে আমার রাসূল প্রেরণ করেছি

অতঃপর আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালত হবে শেষ ও সকল মানুষের জন্য প্রেরিত রিসালত এবং অব্যাহত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।এতে আমরা আল্লাহ তাআলার মহান এক হিকমত বিষয় চিন্তা করতে পারি।

ইতিপূর্বেকার উম্মত একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থান করত। সম্প্রদায়িক পরিচয়ে নির্দিষ্ট এলাকা ছিল তাদের আবাসস্থল, আল্লাহ তাআলা ঐ সময় তাদের প্রতি আঞ্চলিক রাসূল প্রেরণ করতেন প্রত্যেকেই তার জন্য নির্ধারিত অঞ্চলে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিতেন।

দাওয়াত ছিল–

يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

হে আমার কাউম আল্লার ইবাদত কর তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন উপাস্য নেই।

আল্লাহ তাআলা জানতেন মানব জাতি এক সময় পরিণত হবে ও সুপথে প্রদর্শিত হবে, স্থান কালের দূরত্ব ছোট হয়ে একাকার হবে; সে সময় তাদের প্রতি প্রেরণ করবেন একজন রাসূল। তিনিই হচ্ছেন শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি তার রিসালত পৌঁছাবেন সারা বিশ্বের কাছে এবং তার পর

তার অনুসারীগণ প্রত্যেক জনবসতির কাছে তা পৌঁছাবে, যাতে ভূ–খন্ডের কোন অঞ্চল তার রিসালত থেকে বাদ পড়ে না যায়। অন্য দিকে নবী রাসূলদের সূচনা কালেই আল্লাহর জানা ছিল তাদের জন্য প্রত্যক্ষ মুজিযা প্রয়োজন। যাতে উম্মতেরা প্রেরিত রাসুলের রিসালতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। প্রত্যক্ষ মুজিযার বৈশিষ্ট্য হলো নির্দিষ্ট পরিধিতে তা আবদ্ধ থাকে। তাহলো দর্শকদের পরিধি যারা সরাসরি তা দেখার অথবা কাছে থেকে ঘটনা শুনার সুযোগ হয়। এতে করে রাসূলের মুজিযা বিশেষভাবে তার কাউমের লোকেরাই দেখতে পেতো।

অতঃপর আল্লাহ এও জানতেন যে মানব জাতি একদিন পরিণত অবস্থায় ফিরে আসবে তখন শুধু প্রত্যক্ষ মুজিযা যথেষ্ট নয়; যার পরিধি হচ্ছে খুবই সীমিত।

তখন এমন এক মুজিযা প্রয়োজন যার কোন নির্ধারিত পরিধি বা সীমা রেখা থাকবেনা, যা হবে সকলের বোধগম্য। সেই মুজিযা বা আল কুরআন দিয়ে প্রেরণ করেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। যার মাধ্যমে তার রিসালত উপস্থিত অনুপস্থিত সকলের কাছে পৌছে যাবে কিয়ামত পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা তার সৃষ্টি ও তাদের জন্য প্রতি মুহূর্তে কি উপযোগী তা সবচেয়ে বেশী জানেন।

আল্লাহ বলেন–

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿الملك:14﴾

তিনি কি জানবেন না যিনি সৃষ্টি করেছেন? তিনি সুক্ষ্ম জ্ঞানী সম্যক জ্ঞাত।

সকল পর্যায়ের মানবিয় চাহিদাগুলো এ রিসালত অন্তর্ভুক্ত করে

পূর্বেকার রিসালত ছিল নির্ধারিত অঞ্চল ও মানব জীবনের কতিপয় নির্ধারিত বিষয় নির্ভর। তবে সকল রিসালতই এমন এক মহান ও ব্যাপক ঘোষণা ছিল যা ছাড়া মানব জাতি ইহকাল ও পরকালের কোথাও সঠিক থাকতে পারেনা।

তাহলো প্রভুত্বের ঘোষণা–

لا إله إلا الله – أعبدوا الله ما لكم من إله غيره

আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর; তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই।

এর পর এর পাশাপাশি আসতো বিধান ও দিক নির্দেশনা যা প্রেরিত রাসূলের কাউমের জন্য প্রযোজ্য। এবং তাদের মধ্যে বিরাজমান ফাসাদ দূর করতে সক্ষম। যেমন শুয়াইব আলাইহিস সালাম তার কাউমকে বলেছেন –

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿181﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿182﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿الشعراء:183﴾

মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়োনা। সোজা দাড়ি পাল্লায় ওজন কর। মানুষকে তাদের বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে ফিরো না।

লুত আলাইহিস সালাম বলেছেন–

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿165﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿الشعراء: 166﴾

সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর? এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমা লঙ্ঘন কারী সম্প্রদায়।

অতঃপর তাওরাত অবতীর্ণ হলো আরো ব্যাপক আকারে মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সামাজিক অর্থনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে। তবে এটাও নির্দিষ্ট কাওমের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছিল। ঐ কাউমটি হলো বনী ইস্রাঈল।

ঈসা আলাইহিস সালাম প্রেরণ হলেন এবং তার কাউম কে আহ্বান জানালেন এ বলে–

وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ (آل عمران: 50)

আমর এটি পূর্ববর্তী কিতাব সমূহকে সত্যায়ন করে যেমন তাওরাত। আর তা এজন্য যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বস্তু যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল।

মূলত ইঞ্জিলকে মনে করা হয় তাওরাতের পূর্ণাঙ্গ রূপ ও তার কতিপয় আহকামের সংশোধনকারী অথবা বনী ঈস্রাইলের অপকর্মের ফলে তাদের উপর চেপে দেয়া আল্লাহ্‌ কর্তৃক শাস্তি সম্পর্কে নমনীয়তার বিবরণ। অতঃপর ঐ সময়ের আগমন হলো যা আল্লাহ পূর্বেই জানতেন। তা হলো মানব সমাজ পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন বিধান গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন। এবং আল্লাহর মূলত উদ্দেশ্যও ছিল এই রিসালত, যা তিনি কিয়ামত পর্যন্ত ভূ–খন্ডে বহাল রাখবেন। তাই এ রিসালতকে করেছেন এমন এক ব্যাপক রিসালত যা সকল ক্ষেত্রে মানব জাতির সকল চাহিদা পূরণে সক্ষম। এবং তা প্রেরণ করেন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট।

এই রিসালতের সূচনাতেই ছিল ঐ মহান বিপ্লবী ঘোষনা যা অন্য সকল রিসালতে ছিল। তাহলো প্রভুত্বের ঘোষনা কারণ এটাই হচ্ছে মানব জীবনের মৌলিক বিষয়াবলীর মধ্যে সর্ব প্রথম বিষয়, কারণ প্রভুর পরিচয় ছাড়া পৃথিবীতে কোন সংস্কার করাই সম্ভব হয় না। এজন্য দুনিয়াতে ভালো লোকদের এটাই হয় প্রথম চাহিদা।

অতঃপর এতে রয়েছে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রের দিক নির্দেশনা ও কার্যকরী বিধান– রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক ইত্যাদি। এখানে সব বিষয়ের বিস্তারিত পর্যালোচনা সম্ভব নয়। মূলত এটা হচ্ছে ইসলামী শরীয়ত ও শাস্ত্রবিদদের গবেষণার বিষয়। এখানে বিষয়ের সাথে সংস্লিষ্ট তিনটি বিষয় আলোচনা হবে।

সার্বিকভাবে বলা যায় মানব জীবনের এমন কোন বিষয় নেই যে বিষয়ে ইসলাম বিধান অথবা গঠন মূলক বক্তব্য পেশ করেনি। ইসলাম সংগঠিত করে মানুষের সাথে তার প্রভুর সম্পর্কের তা হলো আল্লাহর একাত্ববাদ ও তার আনুগত্যে অবিচল থাকা। এবং মানুষের সাথে তার আত্মার সম্পর্কের– তা হচ্ছে আত্মশুদ্ধি। যে দিকে قد افلح من زكاها আয়াত দিক নির্দেশনা দেয়। এবং এ আত্মশুদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল গুণাবলী ও কাজের। মানুষের সাথে অপরাপর বিষয়ের সম্পর্কের– রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সম্পর্ক অর্থাৎ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তি ও পরিবারে, ব্যক্তিও সমাজে, শাসক ও শাসিতে, মুসলিমে অমুসলিমে সম্পর্ক। ¯\fweK ও A¯\fweK অবস্থায় যা বর্তমান সমাজে প্রচলিত পরিভাষায় দেওয়ানি আইন, ফৌজদারী আইন, ব্যবসায়িক আইন, কার্যপ্রনালী বিধি আইন, শাসনতান্ত্রিক আইন, আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদি আইনের আওতায় প্রকাশ হয়।

বরং বলা যায় ইসলাম মনোযোগ দেয় জীবনের সকল বিষয়ের দিকে যার দিকে পুর্বেকার কোন রিসালত অথবা মানবিয় কোন সংগঠন দৃষ্টি দেয়নি।যেমন : পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা।

আল্লাহ বলেন–

وثيابك فطهر (ألمدثر: 4)

আপন পোশাক পবিত্র করুন।

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الأعراف: 31)

হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেকে নামাযের সময় সাজ সজ্জা পরিধন কর।

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً (النحل: 8)

তোমাদের আরোহনের জন্যে এবং শোভার জন্যে তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন।

সৃষ্টির সৌন্দর্য–

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿ألنحل:6﴾

এদের মধ্যে তোমাদের সৌন্দর্য রয়েছে যখন বিকালে চারণভূমি থেকে নিয়ে আস এবং সকালে চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও।

انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ (الأنعام: 99(

বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন সেগুলো ফলন্ত হয়।

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ (النمل: 60)

বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষন করেছেন পানি অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরক বাগান সৃষ্টি করেছি।

(২) আল্লাহ তাআলা –যিনি এই শরীয়তকে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য নির্ধারণ করেছেন– তিনি জানতেন যে মানুষ তাদের জীবনে অনেক বিষয় দেখতে পাবে এবং দ্বীন অবতীর্ণের দিবসে মানুষের জীবনাচরণ যে অবস্থায় আছে সে অবস্থা সব সময় থাকবে না। এজন্য ইসলামী শরীয়তে আমরা দুই প্রকারের বিধান দেখতে পাই।

(ক) পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা ﾛ¤॥ j Z বিধান ঐ সকল বিষয় যা মানব জীবনে প্রয়োজনীয় ও অপরিবর্তনীয়। যেমন– ইবাদতের অনুষ্ঠানাদি, দন্ড বিধি, বিপরিত লিংগের সাথে সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্ক ও অমুসলমানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক।

(খ) সাধারণ বিধান যার ভিত্তি কতিপয় মূলনীতির উপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা নাই। যেহেতু আল্লাহ তাআলা জানেন মানব জীবনের অবস্থা, পরিবেশ, জীবন ধারণ, ভূ–ভাগের পরিবর্তনে ও আল্লাহর প্রদত্ত মানব শক্তির ব্যবহারের ফলে ঐ সকল বিধানে পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে।

আল্লাহ বলেন–

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ (الجاثية: 13)

এবং আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের যা আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূ মন্ডলে; তার পক্ষ থেকে।
যেমন রাজনীতি ও অর্থনীতি যা যুগের চাহিদা ও প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন হয়। তবে এ পরিবর্তনের পরও অবশ্যই পালনীয় হচ্ছে, কতিপয় মৌলিক নীতির উপর রেখে পরিবর্তন করতে হবে। শাসন নীতির পরিবর্তন হবে তবে আল্লাহর দেয়া সীমা রেখার মধ্যে থেকে তাকে বিকৃতি করে নয়। আইন প্রয়োগ হবে আদল বা ইনসাফ ভিত্তিক, আদলের বিপরীত দূর্নীতি অথবা অন্য কোন পথে নয়। সত্য কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বাধা দানের ক্ষেত্রেও মৌলনীতি পরিবর্তন করা যাবে না।

এমনিভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসবে কিন্তু মূলনীতি বিকৃতি করা যাবে না। যেমন– সুদ, অবৈধভাবে মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মজুত করণ, জবর দখল, লুণ্ঠন করা, প্রতারণা করা, চুরি করা তা যে

কোন পদ্ধতিতেই হোক না কেন? এমনি ভাবে সম্পদ সঞ্চিত না করা, গুনাহের কাজে ব্যয় না করা,বরং যাকাত প্রদান করা, আল্লাহর পথে ব্যয় করা। এই মূলনীতি বহাল রেখে পরিবর্তন করলে শরীয়তের উদ্দেশ্য ও যুগের চাহিদা উভয়টির প্রতিফলন ঘটবে।

(৩) কতিপয় বিষয় যে গুলো সম্পর্কে কোন নাছ বা শরয়ী ব্যাখ্যা নেই এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إن الله تركها رحمة با لناس غير النسيان (الحاكم)

নিশ্চয় এগুলো আল্লাহ তাআলা বর্জন করেছেন মানুষের প্রতি করুনা করে ইচ্ছাকৃত ভাবে, ভুল করে নয়। মানুষের চাহিদানুযায়ী নব নব আবিস্কার গুলোও এর আওতায় আসবে এ বিষয়টি গবেষণার জন্য উন্মুক্ত তবে সতর্কতা Aej¤b করতে হবে যাতে শরয়ী বিধানের সাথে সংঘর্ষক না হয়।

এই বিবরণের ফলে পরিস্কার বুঝা যায় মানব সভ্যতার উন্নয়ন অগ্রগতি ইসলামী শরীয়তের শুরু হতে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামী পরিবেশে থেকেই সম্ভব। সুস্থ অগ্রগতিতে ইসলাম কোন বাধা নয়। হ্যাঁ ইসলামী শরীয়ত বিকৃতি করে অগ্রগতি করতে চাইলে ইসলাম সেখানে সংশোধনের জন্য পথ নির্দেশ করে। কারণ এর উদ্দেশ্যই হলো মানব জীবনকে সুগঠিত করণ সুবিন্যস্ত করণ সকল যুগে সকল পরিবেশে। যাতে সর্বাবস্থায় মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি ও ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হয়।

আল্লাহ বলেন–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿4﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿5﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (ألتين: 4-6(

আমিতো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে। অতঃপর আমি তাকে হীনতা গ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করে। কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মুমিন ও সৎকর্ম পরায়ন; তাদের জন্য তো আছে নিরবাচ্ছিন্ন পুরস্কার। অতএব, ইসলাম আধুনিকতা, ও বিজ্ঞান বিরোধী নয়, বরং ইসলামেই মুসলমানদের উৎসাহিত করেছে বিজ্ঞানের এক বিশাল ভান্ডার সৃষ্টিতে। তাদের বিজ্ঞান গবেষণার বড় দৃষ্টান্ত হলো তাদের বিজ্ঞানাগারেই ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের জন্ম। তাও আবার মুসলমানদের হাতেই স্পেনে, উত্তর আফ্রীকাতে, সিসিলিতে, দক্ষিণ ইসলামিক ইটালীতে যার উপরেই নির্ভর করে গড়ে উঠল আধুনিক বিজ্ঞান। ইসলামী সভ্যতায় করেছিল পৃথিবীকে আলোকিত যখন ইউরোপ মধ্যযুগী অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। সময়টি তাদের জন্য ছিল অন্ধকার আর ইসলামের জন্য ছিল অতি উজ্জ্বল। এই সভ্যতার বিস্ময়কর দিক হলো সকল ক্ষেত্রে সকল দিকে যেখানেই মানুষের বসতি ছিল সেটাকেই এই সভ্যতা জয় করেছিল। তবে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে নয়। যেমনটি আধুনিক জাহিলী সভ্যতা– পশ্চিমা জগত– করে চলছে। এবং তা করেছে ইহকাল ও পরকালের মধ্যে বিভক্তিকে নথিভূক্ত করে। যে সভ্যতা জোর পূর্বক ঠেলে দেয় মানুষকে সস্তা ভোগের সামগ্রীর দিকে যা থেকে নিশ্চিত সৃষ্টি হয় ফাসাদ– ¯f¡‡e, চরিত্রে, জন্ম হয় ভয়ানক সংঘাতের যা ভূখণ্ডকে ধ্বংসের সম্মুখীন করে।

ইসলাম ব্যতিক্রমধর্মী শ্রেষ্ঠ ও সেরা সভ্যতার নির্মাণ করে আবার তা হয় আল্লাহ প্রদর্শিত পন্থায়। এর ফলে মানুষ জাগতিক সুখ, আরাম আয়েশী জীবন থেকেও বঞ্চিত হয় না, আবার মানবীয় কাঠামোও ঠিক থাকে। এ সভ্যতায় মানুষ দুনিয়া ভোগ করে কিন্তু মনুষ্য স্তর হতে পশু স্তরে নেমে আসেনা।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿الأعراف:32 ﴾

হে মুহাম্মদ! তুমি জিজ্ঞেস কর যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে যেসব শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে? তুমি ঘোষণা কর, এ সব বস্তু পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে ঐসব লোকের জন্যে যারা মুমিন হবে, এমনি ভাবে আমি জ্ঞানী সমপ্রদায়ের জন্যে নিদর্শন সমূহ বিশদ ভাবে বিবৃত করে থাকি।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿محمد:12﴾

যারা কুফরী করে ভোগ– বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং জন্তু জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে তাদের নিবাস জাহান্নাম।

(৫) এই রিসালতের চিন্তা পদ্ধতি:

এই রিসালতের ¯ZŠ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আর একটি হচ্ছে হক্ব অনুসন্ধানে এর রয়েছে চিন্তা পদ্ধতি। এই রিসালত একজন মানুষকে পুরোপুরিভাবে m‡¤^vab করে– তার বোধ শক্তি ও আত্মাকে সমান ভাবে। যেমন কুরআন উদ্বুদ্ধ করে মানুষের অনুভূতিকে যাতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়; সৃষ্টি জগতে আল্লাহর নিদর্শন সমূহ প্রতক্ষ্যে। অতঃপর অনুভব করতে পারে আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এতে করে বিনত হয় তার মানসিক আল্লাহর বড়ত্বের কাছে এবং তার অনুগত্য মেনে নেয়। অনুরূপভাবে কুরআন জাগ্রত করে মানুষের চিন্তা শক্তি। যাতে সে গবেষণা ও চিন্তা করে, বাস্তব ভিত্তিক আলোচনা করে ইয়াক্বীন বা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারে। অনুভূতিকে জাগ্রত করার জন্য এ ধরনের আয়াত দ্বারা তাকে m‡Š^vab করা হয়।

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿59﴾ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿60﴾ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿61﴾ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿62﴾ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿63﴾ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿64﴾ (النمل: 59-64)

বল সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি তার মনোনীত বান্দাদের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কে আল্লাহ না ওরা তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে। বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষন করেছেন পানি; অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শিক্তই তোমাদের নেই। অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তারা সত্য বিচ্যুত সমপ্রদায়। বল তো কে পৃথিবীতে বসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ–নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থির রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানেনা। বলতো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থালাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর। বলতো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তার অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদ বাহী বাতাস প্রেরণ করেন? অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তারা

যাকে শরীক করে আল্লাহ তা থেকে অনেক উর্দ্ধে। বলতো কে প্রথবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করেন এবং কে তোমাদের আকাশ ও জমিন থেকে রিযিক দান করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।

আকল বা বুদ্ধিকে জাগ্রত করার জন্য এজাতীয় আয়াত দ্বারা m‡š¦ab করেন–

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ألنحل:17﴾

যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি সে লোকের সমতুল্য যে সৃষ্টি করতে পারে না। তোমরা কি চিন্তা করবেনা?

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا (الأنبياء: 22)

যদি নভোমন্ডলে ও ভুমন্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকতো তবে উভয়েরই ধ্বংস হয়ে যেত।

مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ألمؤمنون:91﴾

আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সাথে কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿ ألمؤمنون:82﴾

এরা কি লক্ষ্য করে না? কুরআনে পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর করও পক্ষ থেকে হতো তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেতো।

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿3﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿4﴾سورة الملك

তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুনাময় আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবেনা। আবার দৃষ্টি ফিরাও; কোন ফাটল দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿170﴾ سورة البقرة

আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমের আনুগত্য কর যা আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না। আমরা তো সে বিষয়ের অনুসরণ করব যাতে আমরা আমাদের বাপ–দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ– দাদারা কিছুই জানতোনা, জানতোনা সরল পথও।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿ألاسراء:36﴾

যে বিষয় তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটাই জিজ্ঞাসিত হবে।

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿سبأ:46﴾

বল আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিঃ তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই দুইজন অথবা এক একজন করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দেখো তোমাদের সঙ্গী আদৌ উম্মাদ নয়। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।

উল্লেখিত আয়াত ও অনুরূপ যে সব আয়াত আছে সেগুলো সম্মিলিতভাবে চিন্তা পদ্ধতির একটি রূপ রেখার জন্ম দেয়। যা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের হক্বের দিকে পৌছায়।

তা সংক্ষেপে কয়েকটি পয়েন্টে উল্লেখ করা যেতে পারে–

অন্ধনুকরণ ও বাপ– দাদাদের থেকে প্রাপ্ত, দলিল প্রমান বিহীন রসম–রেওয়াজকে পরিত্যাগ করা।

কোন মতাদর্শ যাচাই ও যুক্তিক প্রমান নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে তার অনুকরণ না করা। কারণ মানুষকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে চিন্তা ও গবেষণা করার। আল্লাহ তাকে কান, চক্ষু ও বুদ্ধি দিয়েছে সে নিজে চিন্তা করবে যাচাই করবে। কিয়ামতে সে জিজ্ঞাসিত হবে কেন সে অনুকরণ করল? বিষয়ের ভালো– মন্দ না জেনে।

সকল বিষয় যুক্তি গ্রাহ্য চিন্তা করা প্রবৃত্তি মত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা, কারণ প্রবৃত্তি মানুষকে হক্ব থেকে অন্ধ করে রাখে।

মানুষ যখন এ পদ্ধতির অনুসরণ করে, প্রমাণ বিহীন রসম রেওয়াজ প্রত্যাখ্যান করবে অন্ধনুকরণ থেকে দূরে থাকবে দলিল ছাড়া কোন বিষয় গ্রহনে রাজী হবে না। অতঃপর প্রবৃত্তি হতে মুক্ত হয়ে বুদ্ধি বিবেক দিয়ে বাস্তব ভিত্তিক চিন্তা করবে আল্লাহর ইচ্ছায় সে হক্ব পথে পরিচালিত হবে।

পূর্বেকার সকল রিসালত হতে এ রিসালত ¯ZšZv পেয়েছে চিন্তা পদ্ধতির মাধ্যমে। কারণ পূর্বেকার সকল রিসালতে প্রত্যক্ষ মুজিযাই প্রামাণ হিসেবে উথাপিত হতো আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূলের প্রমাণ হিসেবে। আল্লাহ প্রেরিত রাসূলদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যম ছিল তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য মুজিজা পেশ। যা মানুষ প্রত্যক্ষ করত অথবা শুনতো।

কিন্তু রিসালতে মুহাম্মদী যা আল্লাহর ইচ্ছা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকে আল্লাহ তাআলা আকল বুদ্ধির মুখোমুখি করে দিয়েছেন। যাতে m‡¤^vab করা যায় সকল মানুষকে এই রিসালত অবতীর্ণ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। আকল বুদ্ধি মানুষের সঙ্গে যুগের পর যুগ সকল সময় সকল স্থানে বিরাজ করে। শুধু প্রত্যক্ষ কোন মুজিযা নির্দিষ্ট কোন প্রজন্মকে উদ্দেশ্য করে নয়। মানুষের ভিতর অবস্থিত এই সুপ্ত যন্ত্রের মাধ্যমে তাকে আহ্বান জানায় হক্বের আনুগত্য করতে যদি সে সঠিক ভাবে এই বুদ্ধি কে ব্যবহার করে তা হলে হক্ব গ্রহনের বিকল্প অন্য কিছু থাকবেনা। কুরআন কখনো অন্ধ বিশ্বাস করতে আহ্বান করেনা, বরং সকল বিষয় বুদ্ধি বিবেক ব্যবহারের আহ্বান জানায়। এমনকি স্রষ্টার একত্ববাদের ¯K¡Z বিষয়েও – যে আনুগত্য তার জন্য ফরজ। যাতে করে সে পরিতৃপ্তি সহ আনুগত্য করে। তাহলে এ বিশ্বাস হবে অটল– অবিচল কোন সন্দেহ সংশয় থাকবেনা। স্রষ্টা, সিরালত, ওহী পুনরুত্থান এ সব হচ্ছে ঈমানের মূল ভিত্তি। এখানেও কুরআন প্রমান বিহীন আনুগত্যের আহ্বান করেনা। বরং মানুষকে বলে, চিন্তা কর বুদ্ধি খাটাও এবং নিজেকে জিজ্ঞেস কর আল্লাহর সাথে কি কোন উপাস্য আছে? আল্লাহ কি রাসূল প্রেরণ, ওহী অবতীর্ণ করা, মৃতকে জীবিত করা, ও তাদের হিসাব গ্রহনে অক্ষম? যদি বুদ্ধি ব্যবহারের পর উত্তর হয় না, তিনি অক্ষম নয়। তবে ঈমান গ্রহণ ও আল্লাহকে ¯xKvi করা তোমার উপর ফরজ।

এর মানে এই নয় যে মানুষের বুদ্ধি সবকিছু আয়ত্ব করতে সক্ষম বরং যার পরনাই চেষ্টা করে ও সে নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলাম আহ্বান জানায় অনুমোদিত সকল পন্থায় সে তার বুদ্ধিকে ব্যবহার করবে ঈমানের মৌলিক বিষয় সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে। এই ক্ষেত্রে ইসলামেই অন্য সকল রিসালত থেকে ¯Zš|

এরপরও কথা থাকে চিন্তার ¯vaxbZv ইসলাম শুধু আক্বিদাহ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করেনি। বরং অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই ¯vaxbZv দিয়েছে।

কুরআন মানব বিবেকের কাছে যেমন এই দাবী করে যে সে স্রষ্টাকে জানার জন্য তার নিদর্শন সমূহে চিন্তা গবেষণা করবে। তেমনিভাবে এই দাবীও করে, যেন সে আল্লাহর নিদর্শন সমূহে চিন্তা গবেষনা করে, যাতে সে বুঝতে পারে বিশ্বজগৎ সম্পর্কীয় আল্লাহর নিয়ম নীতি; যার উপর নির্ভর করে এ জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। এতে করে সে আল্লাহ তাআলা তার অধীন করে দেয়া বস্তু ও শক্তিকে ব্যবহার করতে জানতে পারবে।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ﴿الجاثية:13﴾

এবং আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য যা আছে নভোমন্ডলে যা আছে ভূ মন্ডলে তার পক্ষ থেকে।

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿الأسراء:12﴾

আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি। অতঃপর নিসপ্রভ করে দিয়েছি রাত্রের নিদর্শন ও দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের পালন কর্তার অনুগ্রহ A‡š¦lb কর এবং যাতে তোমরা স্থির করতে পার বছর সমূহের গননা ও হিসাব এবং আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴿ألبقرة:189﴾

তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তা মানুষের ও হজ্জের জন্য সময় নির্ধারক।

لقد جعل الله لكل داء دواء فاذا مرضتم فتداووا. (ابو داؤد:3376)

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রোগের ঔষধ সৃষ্টি করেছে অতএব অসুস্থ্য হলে তোমরা চিকিৎসা কর।

কুরআন ও সুন্নাহর এ জাতীয় উপদেশ দিকনির্দেশনা দর্শন করা যথেষ্ট নয় বরং তার কারণ অনুসন্ধানে দৃষ্টি দিতে হবে। উম্মতে মুসলিমাহ তো এই জন্যেই প্রেরিত হয়েছিল যে, তারা সমকালিন বৈধ উৎস হতে জ্ঞান আহরণ করবে। অতঃপর এ সঞ্চিত জ্ঞান দিয়ে উদ্ভাবন করবে নিজস্ব বিজ্ঞানাগার, যে বিজ্ঞানাগারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এক সময় ইউরোপ জন্ম দিয়েছিল বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের। এই বিপ্লবের উল্লেখ যোগ্য পদ্ধতি ছিল– দর্শন, পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন। যার উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় সকল আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার। এমনি ভাবে কুরআন দাবী করে মানব বিবেকের কাছে সে যেন আল্লাহর বিধানে তাৎপর্যপূর্ণ চিন্তা, গবেষণা করে। যতটুকু তার জন্য বৈধ করা হয়েছে। যেন পরক্ষণে এই বিধানের বাস্তবায়ন হয় পরিপূর্ণ সতর্কতা ও সুনিপুনভাবে। এজন্য লক্ষ্য করা যায় যে আল্লাহ তাআলা আহকামের আয়াতের সমাপ্তি এভাবে করেছেন।

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ألنور:61﴾

এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে আয়াত সমূহ বিশদ ভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝে নাও।

এই দিক নির্দেশনা থেকেই সৃষ্টি হয় ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের, এ হলো মহামূল্যবান এক বিস্ময়কর ফল যা মুসলিম মেধা হতে জন্ম হয়েছে। এই উদ্ভাবনী আজও কার্যকর। জীবনের উন্নয়নের জন্য, যত দিন জীবন থাকবে ততদিন এর কার্যকারিতাও থাকবে। এমনি ভাবে ইসলাম, মানব বিবেককে দৃষ্টি দিতে বলে আল্লাহর পরিকল্পনা ও রীতি প্রকৃতির দিকে যার উপর ভর করে পৃথিবীতে মানব জীবন পরিচালিত হচ্ছে।

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا ﴿ألفتح:23﴾

তুমি আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد:11)

আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ الروم:41﴾

স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি A¯^v`b করাতে চান যাতে তারা ফিরে আসে।

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿ألأسراء: 16﴾

যখন আমি কোন জনপথ কে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদের উদ্বুদ্ধ করি অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে উঠে। তখন সে জন গৌষ্ঠীর উপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তাকে উঠিয়ে আছাড় দেই।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿الأعراف:96﴾

আর যদি সে জন পদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেজগারী Aej¤^b করত তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামত সমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿الأنعام:44﴾

অতঃপর তারা যখন ঐ উপদেশ ভূলে গেল, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্যে তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি আকস্মীক তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল।

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (الأنفال: 25(

আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষতঃ শুধু তাদের উপর পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালেম।

لتأمرن بالمعروف ولتمنعن عن المنكر أو ليوشكن الله إن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا (يستجاب لكم. (الترمذي:290

অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে বাধা দিবে নচেৎ আল্লাহ তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবে অতঃপর তোমরা দুয়া করবে তবে তা গ্রহণ হবে না।

এই দিক নির্দেশনা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যাতে জানতে পারে, যে তার জীবন নিয়ম নীতি ছাড়া চলছেনা, এবং এমন নয় যে তার কর্মের ফলাফল নেই। বরং মানুষ যে আমলেই করুক ব্যক্তিগত অথবা দলবদ্ধ তার একটা পরিণতি আছে চাই তা দুনিয়াতে হোক অথবা পরকালে। এবং তা হবে আল্লাহর নিজস্ব নিয়ম রীতি অনুযায়ী। ব্যক্তি অথবা দল বিশেষের জন্য এতে কোন পরিবর্তন হবে না। এ জন্য মানুষের উচিৎ সে নির্ধারণ করবে কোন রীতি নিয়ম তার জন্য উচিত হবে এবং কোন কাজ করার পূর্বে তার পরিণতিও সে জেনে নিবে।

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿آل عمران: 137﴾

তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَـٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿ألحج:46﴾

তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকার হতে পারে? বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ হয়না, কিন্তু বক্ষাস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।

অতএব দাবী হচ্ছে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া। ঘটনাবহুল মানব ইতিহাস এমনিতে সৃষ্টি হয়নি বরং আল্লাহর সুচিন্তিত নীতিতেই জীবনাচরণ অগ্রসর হয়। এবং একটা ঘটনার সাথে অপর ঘটনার আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণ যোগসূত্র রয়েছে এবং সেসব রব্বানি জীবনাচরণের প্রতিষ্ঠিত নিয়মেই ঘটছে। অতএব, যখন আকল তাহা চিন্তা করবে এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিবে, নিশ্চিত যে পূর্ববর্তী মানব সমাজ যেসব ভুল করেছিল সে ঐ সব ভুলে নিমজ্জিত হবেনা। বরং তার ভুল সে সংশোধন করে নিবে যাতে দুনিয়াতে আল্লাহর নিয়ম নীতির সাথে সংঘাত না হয় এবং এই সতর্কতা তাকে পরিচালিত করবে পরকালের শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে। আলোচনার আলোকে বলতে পারি, যেসব ক্ষেত্রে ইসলাম মানব বিবেককে চিন্তা ও গবেষণা করতে বলে এমন ক্ষেত্র পাঁচটি।

(ক) সৃষ্টি জগতে আল্লাহর নিদর্শন সমূহে চিন্তা– গবেষণা করা যাতে স্রষ্টার পরিচয়, তারপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তার আনুগত্য অর্জন করা যায়।

(খ) সৃষ্টি জগতে আল্লাহর নিদর্শন সমূহে চিন্তা গবেষণা করা প্রকৃতি শক্তিকে আহরণের জন্য। যার উপর বিশ্ব জগত চলছে, যাতে তার শক্তি কাজে লাগানো যায়, অধীনে নেয়া যায় ভূমন্ডল বিনির্মানের জন্য।

(গ) আল্লাহর প্রজ্ঞাময় বিধানে চিন্তা করা যাতে মানব জীবনের নতুন নতুন বিষয়ে তা প্রয়োগ করতে সুন্দর হয়।

(ঘ) রব্বানী রীতি–নীতিতে চিন্তা গবেষণা করা যে রীতিনুযায়ী ভুখন্ডে মানব জীবন পরিচালিত হয়, মানব সমাজকে সুবিন্যস্ত করার জন্যে।

(ঙ) ভুল থেকে বাঁচতে অতিক্রান্ত মানব ইতিহাসে চিন্তা করা উপদেশ গ্রহণ করা যাতে সরল পথে অবিচল থাকা যায়।

৬। সমৃদ্ধ আইন প্রণয়ন উৎস

এই দাওয়াতের ¯Zš অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এর আইন প্রণয়নের উৎস গুলো সমৃদ্ধ অমুখাপেক্ষী। পূর্বেকার সকল রিসালতের বিধান প্রণয়ন সীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র অবতীর্ণ কিতাবে। কিন্তু এই রিসালতের দাওয়াত কোন নির্দিষ্ট কাউম, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবতীর্ণ হয়নি বরং সকল মানুষের জন্য সর্বকালে সর্বযুগে সমানভাবে কার্যকর উৎস হিসাবে মনোনীত। যা সকল যুগ ও সকল সময় খাপ খায়; তাই আমরা কুরআনের সাথে সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাই কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিষয় গুলোকে ব্যাখ্যা দিতে, আহকাম বিশ্লেষণ করতে, আবার কখনো ¯Zš কোন বিধানের সিদ্ধান্ত দিতে। উদাহরণ ¯i¦c আল্লাহ নামায ফরজ করেছেন কিন্তু নামাজের আহকাম গুলো সুন্নাত থেকে আমরা জানতে পারি। অনুরূপভাবে যাকাত সুন্নাতে রাসুলই এর আহকাম, প্রকার ও পরিমাণ নির্ধারণ করে। কতিপয় আহকাম বিষয়ে সুন্নাতে রাসুল ¯Zš আহকামও বর্ণনা করেছে। যেমন ¯agZ¨wM বিধি, মদ্যপান বিধি, বিবাহিত ভ্যবিচারি ব্যক্তিকে প্রস্তর নিক্ষেপ বিধি, ব্যবসা বিধি। এমনিভাবে কুরআন ও সুন্নাতের পাশাপাশি ঐসব বিষয় যেসব বিষয় কোন নাছ বা বর্ণনা নেই অথবা যেভাবে বর্তমানে নাছ প্রয়োগ করা প্রয়োজন সেভাবে

রাসূলের যুগে প্রয়োগ হয়নি ইজতেহাদের দ্বারও উন্মুক্ত। এ ব্যাপকতাই এই শরীয়তকে সর্বকালে মানবজাতির কল্যাণে প্রয়োজনীয়তার গ্যারান্টি দেয়। এর আওতায় জীবন চলাচলে হবে অগ্রগতি, উন্নতি। জীবন চাঁকা থাকবে সচল। তবে এ ইজতিহাদটি পূর্বেকার রিসালাতকে বৈধতা দানকারি হতে পারবে না। কারণ আল্লাহ ঐ সব কিতাব নির্দিষ্ট সময়ের পর বাতিল করে দিয়েছেন। আর এই কিতাব– এর কোন রহিতকারী নেই। এজন্য ইহাকে আল্লাহ প্রদান করেছেন ব্যাপক ও বিস্তৃতির ক্ষমতা ও ভুখন্ডে নতুন সজীবও প্রাণবন্ত সৃষ্টির ক্ষমতা।

ওলামাগণ সর্বসম্মতভাবে শরীয়তের উৎস হিসাবে চারটি মূলনীতি নির্ধারণ করেন

(ক) আল–কুরআন।

(খ) সুন্নাতু রাসূল।

(গ) ইজমা।

(ঘ) ক্বিয়াস।

৭। মানব প্রকৃতির অনুকূল:

যখন আমরা বলি এই রিসালত মানব প্রকৃতির বা ফিতরাতের অনুকূল তার অর্থ এই নয় যে পূর্বেকার রিসালত মানব প্রকৃতি বিরোধী অথবা নির্দয়। প্রত্যেক রিসালতেই মূলত আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত (যদিও পরবর্তিতে বিকৃতি করা হয়েছে) তবে পূর্বেকার রিসালতে যেমনটি আগেও আলোচনা হয়েছে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে নির্দিষ্ট কাওম ও নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি। এজন্য পূর্বেকার সকল রিসালত আঞ্চলিক ও আংশিক বিষয় প্রতিকার করতো। আর রিসালতে মুহাম্মদী হচ্ছে বিশ্বজনীন রিসালত, সকল কাল সকল যুগ বিস্তৃত। এর আগমন হয়েছে সকল মানুষের সংশোধনের জন্য। কোন শ্রেণী, বর্ণ, ভাষা, কাল ও স্থান নেই। এ জন্য ইহা সর্বাবস্থায় মানব প্রকৃতির সঙ্গে কাজ করে। এই রিসালত যখন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয় তখনই এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছিল।

আল্লাহ মানব প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা, তিনি সবকিছু জানেন কোনটি এর জন্য উপযোগী আর কোনটি অনুপযোগী। এই দ্বীন তিনি অবতীর্ণ করেছেন তার প্রজ্ঞা মত এবং ব্যাখ্যা দিয়েছেন মানুষের শক্তি সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে।

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (الروم: 30)

এটাই আল্লাহর প্রকৃতি যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম।

যতই সময় অতিবাহিত হলো ও মানুষ জাহিলি প্রথা পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হলো আল্লাহর পদ্ধতি ছেড়ে, ততই তারা অস্থিরতা ও বিপথে পতিত হলো এবং হচ্ছে। এতে করে এই দ্বীন যে মানব প্রকৃতি উপযোগী দ্বীন, সে রহস্য আরো বেশি স্পষ্ট হলো।

আল্লাহর সৃষ্টি নিয়মে মানব প্রকৃতিতে কতিপয় ঝোঁক রয়েছে যা গচ্ছিত রাখা হয়েছে মানব প্রকৃতিতে। যাতে মানুষ যথার্থভাবে নির্ধারণ করতে পারে তার উপর অর্পিত ভূ–খন্ডের প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে। সে ঝোঁক হলোঃ আহার করা, পান করা, পোষাক পরিধান, বাসস্থান, মালিক হওয়া, নিজেকে প্রতিষ্ঠিতা করণ ইত্যাদি। এই ঝোঁক বা চালিকা শক্তি ভূ–খন্ড আবাদের জন্য প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মানব অস্তিত্বের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। যদি

তাহা চলতে থাকে কোন নিয়ম নীতি ছাড়া। তখন প্রকৃতি পরিবর্তিত হবে অবাধ্য প্রবৃত্তির দিকে, মানুষও তখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হবেনা। অতএব অনুকরণীয় সহনশীল একটি নিয়ম নীতি এই ঝোঁককে যুক্তিকভাবে বৈধতা দিতে পারে একেবারে বাতিলও নয় আবার মূলনীতি ধ্বংস করেও নয়। একই মূহুর্তে তার অবাধ বিচরণও নিয়ন্ত্রণ হবে। তখন ¯f\e প্রকৃতি প্রবৃত্তিতে রূপান্তর হবেনা। অতএব মানুষ ভোগ করতে থাকবে তার জন্য উপকারি বস্তু একই মুহূর্তে তার আচরণ কে একটি সীমা রেখার মধ্যে পরিচালনা করবে যাতে ধ্বংস ও নষ্টের দিকে ধাবিত না হয়।এই কাজটিই করেছে ইসলাম।
ঝোঁক বা চাহিদা কে ইসলাম বৈধ মনে করে। একই সাথে এটাকে পরিমার্জিত করার ও মানব অস্তিত্বের সীমা রেখার মধ্যে থেকে উন্নত করার জন্যও কাজ করে, যেন অবাধ্য প্রবৃত্তির আকার ধারণ না করে। বরং প্রজ্ঞাময় আল্লাহর অংকিত নিয়ম–নীতিতে পরিচালিত কতিপয় উৎসাহ ও আগ্রহ হিসাবে গণ্যহয়।

আল্লাহ বলেন–

تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا (البقرة : 187)

এটা হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমা। অতএব, এর কাছেও যেওনা।

تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا (البقرة: 229)

এটা হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমা,কাজেই একে অতিক্রম করোনা।

এ কারণে ইসলাম বৈরাগ্যতাকে সমর্থন করেনা। কারণ এটা ¯f\e প্রবণতাকে নষ্ট ও দমন করে দেয়।
তিন ব্যাক্তির একটি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরে গেলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইল। যখন তাদেরকে জানানো হলো। তারা নিজেদের ইবাদতকে খুব অল্প মনে করল। অতঃপর একজন বলল আমি সারাবছর রোজ রাখব, রোজা ভঙ্গকরবনা। অপর জন বলল আমি রাত্রি জাগ্রত থেকে ইবাদত করব, ঘুমাবো না, তৃতীয় জন বলল আমি নারীকে বিবাহ করব না। তাদের বিষয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে তাদের বললেনঃ আল্লাহর শপথ নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে বেশি ভয়কারী। তবে আমি রোজা পালনকরি, সময়ে খাবারও গ্রহন করি, নামায আদায় করি, ঘুমাই, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। অতএব যে আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করে সে আমার অন্তর্ভূক্ত নয়।
অনুরূপভাবে ইসলাম অবাধ্য প্রবৃতিতে ডুবে যাওয়াকেও সমর্থন করেনা। যা বিশেষ করে প্রচলিত জাহিলিয়াত সৃষ্টি করেছে, যাতে ¯f\e প্রকৃতি ধ্বংস হয়, চরিত্র ধ্বংস হয়, মানুষ পর্যভূষিত হয় পশুত্বে।

আমরা দেখতে পেয়েছি পূর্বের হাদিসে সর্বোত্তম আকৃতিতে ভারসাম্যের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। বস্তুত জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম এ উদাহরণ পেশ করে।

ভারসাম্যহীনতার একটা উদাহরণ: পশ্চিমা পুঁজিবাদ অনুমোদিত ব্যক্তি মালিকানা, এ মালিকানার কোন সীমা ও নিয়ম নীতি নেই। ফলে তাতে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, অত্যাচার জন্ম হয়। যা পশ্চিমা জগতে বিরাজমান। কমিউনিজম ব্যক্তি মালিকানাকে A¯xKvi করে। এতে ব্যক্তি মালিকানার কোন সুযোগ নেই। ফলে ব্যক্তির প্রেরণা ধ্বংস হয় উৎপাদন সংকুচিত হয়। পরিণতিতে এক সময়কার পৃথিবীর সেরা গম উৎপাদন খামারের মালিক রাশিয়া উৎপাদন অপর্যাপ্ত হওয়ায় আমেরিকা হতে গম আমদানি করতে হয়েছিল এবং এভাবে কমিউনিজম ধ্বংস হলো।
ইসলাম মাঝা মাঝি অবস্থান করে
ইসলাম প্রকৃতির সাথে মিলে অগ্রসর হয়। তাই শুরু থেকেই ব্যক্তি মালিকানা অনুমতি দেয়। যাতে ব্যক্তি আপন প্রেরণায় কাজ করার সুযোগ হয়। এবং কমিউনিজমের মত ব্যক্তি মালিকানাকে দমনও করেনা। বরং

একটি আদর্শ নিয়ম নীতি প্রণয়ন করে যা জুলুম ও ফাসাদ থেকে দূরে রাখে। সুদ হারাম করে, মজুত করণ, লুন্ঠন, চুরি, ধোকাবাজি ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে এবং এ অবৈধ পথে সম্পদের মালিক অথবা সম্পদ বৃদ্ধি হারাম ঘোষণা করে। অতঃপর যাকাত ফরজ করে যা সম্পদ বৃদ্ধির সীমা বেঁধে দেয় ও সম্পদে দরিদ্র শ্রেণীকে অংশিদার বানায়। এ হলো এমন কতক নিয়মাবলী যা পশ্চিমা ব্যবস্থার সৃষ্ট চরিত্র ধ্বংস ও সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জুলুম থেকে হেফাজত করে। এভাবে আমরা যদি খুঁজতে থাকি দেখতে পাব মানব জীবনের সকল পর্যায় ধর্ম ও মানব প্রকৃতির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্য বিরাজ করছে ইসলামে। এমনিভাবে পথ ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষার দিকনির্দেশনা অথবা ধ্বংসে পতিত মুহুর্তে নিজেকে রক্ষার প্রদ্ধতি রয়েছে এই ইসলামেই। এতে করে ¯f\⁄e প্রকৃতিতে শান্তি ও জীবনে স্থিতি ফিরে পায়।

ইসলামের মহানুভবতা:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج: 78)

তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি।

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: 185)

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না।

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿النساء: 28﴾

আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দূর্বল সৃজিত হয়েছে।

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (المائدة: 6(

যদি তোমরা রুগ্ন হও অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব– পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। অর্থাৎ ¯^xq মুখ–মন্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদের অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি ¯^xq নেয়ামত পূর্ণ করতে চান। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه: (البخاري

ইসলাম ধর্ম হচ্ছে সহজসাধ্য। যে দ্বীন বিষয় কঠোরতা করে সে পরাজিত হয়।

এই দ্বীনকে আল্লাহ মূলত মানুষের কষ্টের জন্য অবতীর্ণ করে নাই। মানুষকে কষ্ট এবং তাদের উপর কঠোরতা করে আল্লাহ লাভ কি?

إن الله بالناس لرؤف الرحيم: (البقرة: 143)

নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল করুনাময়।

অনুরূপভাবে আল্লাহ মানুষকে পরকালেও কোন শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿النساء:147﴾

যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও ও বিশ্বাস স্থাপন কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করে কি করবেন? আল্লাহ পুরুস্কার দানকারী, সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ এই দ্বীন মানুষের উপর অবতীর্ণ করেছেন, মানুষের জন্য মানুষেরই কল্যাণে তারা যেন হয় সুন্দরতম গঠনে যেভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা যেন যোগ্য হয় সে সম্মানের যা আল্লাহ তাদের দান করেছেন।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (الإسراء : 70)

আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।

মানবের জন্য এই দ্বীন তো আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। তারপরও তারা এই দ্বীনের অনুসরণ করলে আল্লাহ তাদের পুরস্কৃত করবেন জান্নাত ও তার সন্তুষ্টি দিয়ে। তাদের নেক কাজের প্রতিদান ¯i¦c| বস্তুত আল্লাহ গুণগ্রাহী মহাজ্ঞানী।

ইসলাম মানব প্রকৃতি সংশোধন করে ধীরে ধীরে, মানুষের উন্নয়নের জন্যই। বড় কোন বিষয়ও তার উপর আরোপ করেনা; তাহলে সে অপারগতা প্রকাশ করবে, বরং ধীরে ধীরে তাকে উপরে উঠিয়ে নেয়,যাতে তার প্রদক্ষেপ সঠিক হয়। আরোহন সু-পরিণিত হয়। এতে করে সে সংশোধনকে ভালবাসবে এর প্রতি আগ্রহী হবে। ইসলাম ঐ পরিমাণ তাকে মুকাল্লাফ বা দায়িত্বারোপ করে যা ছাড়া মানব জীবন যথাযথ হয়না। বাকীগুলো বাধ্যবাধকতা নেই। †¯'ÖvKvR এবং ধারাবাহিক উন্নতির বস্তু হিসাবে পছন্দনীয় করে রাখে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿14﴾ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿15﴾ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿16﴾ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿17﴾ (آل عمران: 14-17)

মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তর ভালবাসা- নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু, শস্যক্ষেত। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী। আর আল্লাহ, তার নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল। আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম বস্তুর সংবাদ দেব? যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ ও আল্লাহর পক্ষ হতে সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। যারা বলে, হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা ঈমান আনলাম। অতএব, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব হতে রক্ষাকরুন। যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, আনুগত্যশীলও ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী।

আপনি লক্ষ্য করেছেন কি কিভাবে? ইসলাম মানব আত্মাকে সংশোধন করছে। এই প্রবৃত্তিগুলো মানুষের নিকট আকর্ষনীয় যা আয়াতদ্বারাও ¯úKZ| এগুলোর অস্তিত্ব কি আল্লাহ হারাম বলেছেন? কখনো নয়। আল্লাহ এর জন্য একটি সীমা রেখা নির্ধারণ করেছেন এর আওতাভূক্ত হলে বৈধ হবে আর সীমাতিক্রম করলে অবৈধ হবে। অতএব একটা সীমারেখার মধ্যে এটা অনুমিত। তবে ইসলাম মানুষের জন্য পছন্দ করে তারা যেন প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেন। এটাই যেন সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু না হয় এবং আল্লাহর পথে জিহাদ থেকে তাকে যেন ব্যস্ত না রাখে। যা আবশ্যকীয়। অথবা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বাধা গ্রস্থ না করে তাহলে তার পরকাল বিনষ্ট হবে। তাই শরীয়ত প্রবর্তক বলেছেন-

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُم

বল: তোমাদেরকে এটা অপেক্ষাও উত্তম বস্তুর সংবাদ দিব? যা এসব প্রবৃত্তিতে নিমগ্ন থেকেও উত্তম? তাহলো জান্নাত। যাতে রয়েছে চিরস্থায়ী নেয়ামত রাজী ও সন্তুষ্টি। সহানুভূতি ও আকর্ষণীয় ভংগিতে কার জন্য এই নিয়ামত এখানে তা চিত্রায়িত করেছেন। ঐ সকল বান্দাদের জন্য যারা এই নেয়ামতের উপযুক্ত। তারা হলেন সহিষ্ণু, সত্যবাদী, ধর্মপরায়ন, আল্লাহর পথে ব্যয়কারী, রাতের শেষাংশে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। সবকটি গুণাবলীই মহৎ ও আত্মার কাছে প্রিয়। এই সুন্দর উপস্থাপনের মাধ্যমে কুরআন এ সবের দিকে উৎসাহিত করে। আপনি লক্ষ্য করেছেন মানুষ যদি তার আত্মাকে ঐ পূতগুনাবলী অর্জনে ব্যস্ত রাখে, তাহলে সে কি প্রবৃত্তিতে নিমগ্ন থাকতে পারে, সে ¯vfweKfv‡eB এ থেকে ফিরে থাকবে। কোন প্রকার কষ্ট বা জটিলতা অনুভব ছাড়া। একই মহূর্তে ইসলাম এই মতও পোষণ করেনা যে সে বৈরাগ্যের মত একেবারে প্রবৃত্তি মুক্ত থাকবে। বরং তা পছন্দনীয় যুক্তিসঙ্গতির ভিতর হবে। দেখুন ইসলাম রাত ও দিনে একটি নির্ধারিত পরিমান নামায ফরজ করে, তবে নফল ইবাদতেও উৎসাহিত করে।খুবই আকর্ষনীয় পদ্ধতিতে।

ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصربه ويده التى يبطش بها. (البخاري:2061)

বান্দা যখন আমার নিকটবর্তী হতে থাকে নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। অতঃপর যখন তাকে ভালোবাসি আমি তার কান হই যা দিয়ে সে শুনে চক্ষু হই যা দিয়ে সে দেখে হাত হই যা দিয়ে সে ধরে।

এমনিভাবে রমযান মাসের রোযা ফরজ করে, তবে নফল রোযার প্রতিও উৎসাহিত করে। নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদে যাকাত ফরজ করে, তবে আল্লাহর পথে দান খায়রাতেও আগ্রহী করে। এভাবেই মানুষের মধ্যে আমলে উন্নতির আগ্রহ জন্ম দেয়, যাতে সে এটাকে মুহাব্বত করে ও তার উপর অবিচল থাকে। এবং প্রযোজ্য হয় তার উপর নিম্নবর্ণিত এই বৈশিষ্ট্য।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿فصلت:30﴾

যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।

আর আরোপিত ফরজ (আবশ্য পালনীয়) সে ক্ষেত্রেও বান্দার শক্তি সাধ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে–

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: 286)

কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেন না।

অর্পিত দায়িত্ব থেকে পলায়নকারী অথবা অভিযোগকারী না হয়ে, যদি প্রকৃত অপারগ হয়, সে ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআলা তার অপারগতানুযায়ী সহজ করে থাকনে এবং তাকে বলতে বলেন–

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿286البقرة)

হে আমার প্রতিপালক! যদি আমাদের ভ্রম অথবা ত্রুটি হয় তৎজন্যে আমাদেরকে ধৃত করবেন না, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের পূর্ববর্তীগনের উপর যেরূপ গুরুভার অর্পন করেছিলেন আমাদের উপর তদ্রুপভার অর্পন করবেন না। হে আমাদের প্রভু যা আমাদের শক্তির অতীত ঐরূপ ভার বহনে আমাদেরকে বাধ্য করবেন না এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমাদেরকে মার্জনা করুন। আমাদের দয়া করুন।
যদি সে স্খলিত হয় আল্লাহ তাকে তার দয়া থেকে তাড়িয়ে দেন না। তবে যদি বার বার করে।

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿البقرة: 37﴾

অন্তর আদম ¯¦q প্রতিপালক হতে কতিপয় বাক্য শিক্ষা করলো, আল্লাহ তখন তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল করুনাময়।

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿135﴾ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿136﴾ آل عمران

এবং যখন কেউ অশ্লীল কার্যকরে কিংবা ¯¦q জীবনের প্রতি অত্যাচার করে তৎপর আল্লাহকে স্মরণ করে অপরাধ সমূহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ ব্যতীত আর কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা করেছে সে ব্যাপারে জেনে শুনে হঠকারিতা করেনা। তাদের পুরস্কার হলো তাদের প্রভুর নিকট হতে মার্জনা এবং এমন উদ্যানসমূহ যেগুলোর তলদেশে দিয়ে †mªZ¯^bx সমূহ প্রবাহিত থাকবে, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে এবং সৎকর্মশীলদের জন্যে কি সুন্দর প্রতিদান।
এর চেয়ে বড় আর মহানুভবতা কি? যেখানে পাপীদের প্রতিও সহানুভূতি প্রদর্শিত হয়।

পয়গামে মুহাম্মদীর উচ্চ মূল্যবোধের কতিপয় নমুনা

১। একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা

প্রত্যেক রিসালাত মূলত একত্ববাদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হয়েছে। যা ছেড়ে মানুষ শিরকে জড়িয়ে ছিল।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (النحل: 36)

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿الأنبياء:25﴾

আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। অতএব আমরই ইবাদত কর।

এর পরও যিনি কুরআনুল কারীমে গবেষণা করবে, খুব সহজে তার দৃষ্টিতে আসবে যে কুরআন প্রথমেই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপস্থাপন করে ব্যতিক্রম ধর্মী উপস্থাপনায় যা পূর্ববর্তী রিসালত সমূহে অনুপস্থিত।
আল্লাহর ইচ্ছা এই রিসালত অব্যাহত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত এবং তা অবতীর্ণ করেছেন বিশ্ব জগতের জন্য। এজন্য আমরা দেখতে পাই একত্ববাদ বিষয়ক সকল সন্দেহ যা হৃদয়ে জন্মাতে পারে সেগুলো কুরআনুল করিমে আলোচনা হয়েছে। এবং অবিরাম আঘাত করেছে সব সন্দেহর উপর যাতে অন্তর থেকে ঐগুলো দূরীভূত হয় এবং যাবতীয় অন্ধকার থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন আক্বিদাহ প্রতিষ্ঠা হয়।

বস্তুত: কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রক্কালে যে সকল সন্দেহ সমাজে বিরাজ করেছিল সেগুলোকে খন্ডন করে। সেগুলো আরব মূর্তিপূজক অথবা আহলে কিতাব–ইহুদী খৃষ্টান যার মাঝেই হোক না কেন। তবে তাওহীদ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগের উদ্দেশ্য শুধু সন্দেহ খন্ডন করা ছিলনা। বরং এতে একত্ববাদের আলোচনা ও

ঈমান জোরদার করার প্রতি আহ্বান এবং অন্তরে ঈমান যেন ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং বান্দার ঈমান পূর্ণতা পায় সেটি উদ্দেশ্য ছিল। সেলক্ষ্যে মদিনাতেও ঈমানদারদের উপর ঈমান বিষয়ক আয়াত অবতীর্ণ হয়। অথচ তারা পূর্বেই ঈমান এনেছেন। এমন কি ঈমান ভিত্তিক একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার পরও। যে সমাজের উপর দাঁড়িয়ে তারা দ্বীনের সাহার্য্যে লড়াই করছে এবং খোলাখুলি একটি রাষ্ট্র ঈমানের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে কাজও করছে, তার পরও তাদেরকে ঈমানের প্রতি দাওয়াত এটা এক বিশাল ব্যাপার।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ (النساء: 136)

হে মুমিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি ও তার রাসূলের প্রতি এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা তিনি তার রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন।

এটা পরিস্কার যে এ আহ্বান কাফিরদেরকে নয় ঈমানদারদের প্রতি এ আহবান করা হয়েছিল। ঈমানদারদের প্রতি যারা পূর্বেই ঈমান এনেছেন। এর অর্থ হলো এ আহ্বানের মাধ্যমে ঈমানের উপর অবিচল থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করণ এবং ঈমান বৃদ্ধির জন্য আহ্বান জানানো।

হ্যাঁ! কুরআন তাওহীদ ও শিরক বিষয়কে স্পষ্ট করে দিয়েছে, সকল পথ ও পন্থায়। যা মানব আত্মা উপলদ্ধিও করতে পারে। যাতে কোন দিক থেকে শিরক বাসা বাঁধতে না পারে মুমিনের আত্মায়। চিন্তা, কর্ম, অনুভূতি বা অন্য কোন উপায়ে। এমনিভাবে কুরআনুল কারীম আরো একটি বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তাহলো শুধু গাইরুল্লাহর ইবাদত আরাধনার নাম শিরক নয় বরং আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ শরীয়ত বিহীন শাসন পরিচালনা করাও শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿الأعراف: 3﴾

তোমরা অনুসরণ কর যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে বন্ধু ও অভিভাবকরূপে অনুসরণ করোনা, তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿النحل: 35﴾

মুশরিকরা বলল: যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমরা তাকে ছাড়া কারও ইবাদত করতাম না এবং আমাদের পিতৃ পুরুষেরাও করতনা এবং তার নির্দেশ ছাড়া কোন বস্তুই আমরা হারাম করতাম না।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা আল্লাহকর্তৃক নাযিলকৃত বস্তুর অনুসরণ না করায় তাদেরকে মুশরিক বলে সম্বোধন করেছেন। অর্থাৎ এও শিরকের অন্তর্ভূক্ত। যাহা সূরা আরাফের উল্লেখিত আয়াতে প্রকাশ। সূরা নাহলের আয়াতে শিরকী কাজগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন মুশরিকদের ভাষায়– তাহলো মুশরিকগণ গায়রুল্লাহর উপাসনা করে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বস্তু হালাল বা হারাম ঘোষণা করে। অর্থাৎ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের অনুসরণ না করায় তারা মুশরিক।

সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿النساء:65﴾

অতএব তোমার পালনকর্তার কসম, তারা ঈমানদার নয় যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন রকম দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।

এ সম্পর্কে (আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ বিধান বিহীন শাসন পরিচালনাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত) সূরা মায়েদাতে কয়েকটি বর্ণনা এসেছে।

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿المائدة:44﴾

যে সব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই কাফির।

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿المائدة: 45﴾

যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করে তারাই জালেম।

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿المائدة:47﴾

যে সব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করেনা তারাই পাপাচারী।

সূরা আল–নূর থেকে স্থীর হয় যে, ঈমানের দাবীর প্রকৃত প্রমাণেই হলো যে কোন বিচার ফায়সালাকে আল্লাহর শরীয়তের উপর সমর্পন করা। তা না হলে ঈমানের দাবী মিথ্যা বলে গণ্য হবে।

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿47﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿48﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿49﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿50﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿51﴾ (النور: 47-51)

তারা বলে, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আনুগত্য করি; কিন্তু অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরয়ে নেয় প্রকৃত তারা বিশ্বাসী নয়। তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মূখ ফিরিয়ে নেয়। সত্য তাদের ¯c‡¶ হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি রোগ আছে? না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে; না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তার রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবে? প্রকৃত তারাই তো অবিচারকারী। মুমিনদের যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তাদের বক্তব্য কেবল এ কথাই হয় আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম।

কুরআন বারবার ব্যাপকভাবে একটি বিষয় মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহলো এ সৃষ্টিজগতে যা কিছু আছে তার স্রষ্টা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ এবং এককভাবে তিনিই সকল ইবাদতের যোগ্য। এককভাবে তারই আনুগত্য জরুরী এবং সকল বিষয়ে গৃহীতও হবে একমাত্র তারই ফয়সালা।

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (الأعراف: 54)

জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই।

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿يوسف: 40﴾

আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করোনা। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ (الشوري: 21)

তাদের কি এমন শরিক দেবতা আছে যারা তাদের জন্য সে ধর্মসিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।

এই বিষয়টি উপস্থাপনের সময় ব্যাপকভাবে উপস্থাপন হয়, সৃষ্টিজগতে আল্লাহর নিদর্শন সমূহ– যে নিদর্শনগুলোর আকর্ষণীয় বর্ননা দিয়ে পবিত্র কুরআন সমৃদ্ধ। যাতে মানুষের অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ করে

এই বিশ্বাস যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টি কর্তা। তিনি একমাত্র উপাস্য। এই আক্বিদাহকে সুদৃঢ় করার জন্য কুরআনুল কারীম বিভিন্ন মাধ্যম গ্রহণ করে থাকে।

১। আল্লাহ যাবতীয় অনুগ্রহ সম্পর্কে বলে থাকেন যে, এ অনুগ্রহ একমাত্র আল্লাহর থেকে অন্য কারো নই। যাতে অনুগ্রহ–দয়ার ফলে মানুষের অন্তর আল্লাহ মুখী হয়।

২। স্থায়ীভাবে স্মরণ করিয়ে দেন যে, মানুষের ভাল–মন্দ সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। অন্য কেহ আল্লাহর নিয়মকে কোনভাবেই পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখেনা।

৩। আল্লাহর পরিচয়, গুনাবলী ও তার পবিত্র সুন্দর নামগুলো অবগত হওয়া। এবং এগুলো এমনভাবে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, তাহা আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসকে অনুভুতিতে সুদৃঢ় করে এবং অন্তরে এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়। অতঃএব এটা সুদূর প্রসারী শিক্ষা বা মাধ্যম, একত্ববাদের বিশ্বাসকে মানব অন্তরে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে।

এ মাধ্যমগুলো একত্ববাদের বিশ্বাসকে মানব অন্তরে সুদৃঢ় করে এমন পদ্ধতিতে যার উদাহরণ পূর্বের মানব ইতিহাসে অনুপস্থিত। ফলে পৃথিবীতে একত্ববাদ একটি সন্দেহ মুক্ত আক্বিদাহ হিসাবে ¯xKZ হয়েছে। মুসলমান কর্তৃক সংঘটিত কারণে যদিও কখনো এ আক্বিদায় বিকৃতির মিশ্রণ ঘটে। কিন্তু ইসলামে একত্ববাদের আক্বিদা এমনি একটি স্পষ্ট ও সুদৃঢ় শক্তি যে, বিকৃতিকারীগণ বিপথে স্থীর থাকতে পারে না। তারা দ্রুত ফিরে আসে বিশুদ্ধ মূলনীতির দিকে। আর পৃথিবীতে এ রীতিটি ইসলামের পূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। ইতোপূর্বে তাওহীদ ভিত্তিক সকল ধর্মই তার অনুসারীদের হাতে বিকৃতি হয়েছে, এমন কি তাওহীদের মৌলিক বিষয় বস্তুর মধ্যেও। যার ফলে একত্ববাদের মূল কাঠামো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র ইসলামেই যুগ যুগ ধরে ¯xq কাঠামোয় দাঁড়িয়ে আছে। কেউ পথ ভ্রষ্ট হয়েছে কেউ তার সাথে অন্যায় আচরণ করেছে, কিন্তু ইসলামের মূলনীতি ছিল সুদৃঢ় এতে কোন প্রকার বিকৃতি হয়নি। যার জন্য বহু কাল পরও ফিরে আসতে হয়েছে মানুষকে একত্ববাদী আক্বীদার দিকে।

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: 19)

নিশ্চয় ইসলামই হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান।

২। মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

ইসলাম যে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে পৃথিবীর অন্য কোন ব্যবস্থা এ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে নাই। পশ্চিমা গনতন্ত্র ব্যাপকভাবে দাবী করে যে সেই প্রথম মানব অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এই দাবী দুই দিক থেকে বেজাল দাবী।

১–ইতিহাস: পশ্চিমা গণতন্ত্রের চেয়ে অন্তত ১০০০ এক হাজার বছর এগিয়ে আছে ইসলাম, মানব অধিকার প্রতিষ্ঠায়। যখন ইউরোপ মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল এবং f¯^gx‡`i পদাঘাতে দূর্বল ও আসাড় হয়ে পড়েছিল। f¯^gxi একক শাসনাধীনে সাধারণের জীবন যাপন করতে হতো দাস হিসাবে কোন মর্যাদা বা সম্মান তাদের ছিলনা। যখন মনে চাইতো তাদের হত্যা করা হতো, থাকতে হতো তাদের অনাহারে অর্ধাহারে, খাটানো হতো বেকার। এহেনে অবস্থায় ইসলামের সুভাগমনে মানুষের সম্মান, সম্পদ ও জীবনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হলো। প্রতিষ্ঠা হলো মানবাধিকার।

২– বাস্তবতা : ইসলাম এসে সমুপযুগী ও বাস্তবভিত্তিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করল। আর ইউরোপ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করল, কাগজে কলমে নথি–পত্রে আন্তর্জাতিক সনদ ও চুক্তি পত্রে। বাস্তব ক্ষেত্রে এর কোন প্রয়োগ নাই। উপনিবেশবাদীরা বিভিন্ন জাতি– গোষ্ঠীর ইজ্জত আব্রু যেখানে কেড়ে নিচ্ছে যেখানে

মানবাধিকার কান্না ছাড়া আর কিছু করার থাকেনা। জাতিগত বিভক্তি সৃষ্টিতে মানবাধিকার কোথায়? যখন কালো মানুষ গুলো শুধু কালো হওয়ার কারণে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়? ফিলিস্তিনে মানবাধিকার কোথায়? আপন ভূমি থেকে যাদের জোর করে নির্ভাসন করা হয়। জোর করে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এককভাবে তাদের ভূমি দখলের জন্য। মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম নিয়ন্ত্রিত কসাইখানাতে মানবাধিকার কোথায়? যেগুলো মুসলমান হত্যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে? মানবাধিকার শুধু কাগজে–কলমে, প্রচার মাধ্যমে, বাস্তবে তার কোন ভিত্তি নাই। পশ্চিমা বিশ্বে গণতন্ত্র পন্থী ও তার অনুসারীদের বাহ্যিক আচরণ লক্ষ্যনীয়। তারা ব্যক্তির কাজ, কথা ও বিশ্বাসের ¯^vaxbZvi কথা বলে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের কোন হস্তক্ষেপ বৈধ মনে করে না, যদি কিনা সে রাষ্ট্রীয় আইনের বিরোধীতা না করে। এতে কতিপয় নিরাপত্তার বিষয় বলা হয়। বিনা অপরাধে আটক করা যাবেনা। ব্যবস্থা নিতে হলে আইনের আওতায় নিতে হবে। ফায়সালা হবে সংবিধান মত। ব্যক্তির উপর জোর ঘাটানো যাবেনা। এ ব্যাপক ¯^vaxbZvq অবকাশ থাকে অশান্তির, অরাজকতার, অবিশ্বাসী– নাস্তিকতার, সকল প্রকার চারিত্রিক অনিষ্টতার। অন্য দিকে তারাই এ ¯^vaxbZv‡K ব্যাপকভাবে খর্ব করে দেয় পুজিবাদি কোন ¯^v_ সামনে আসলে। নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী বিপদের আশংকায়। অতএব, পুজিবাদ ও গণতন্ত্র কোথাও মানুষকে যথাযথ মর্যাদার স্থানে বসানো হয় না। কমিউনিজম যাকে প্রকৃত গণতন্ত্র মনে করা হতো। তাতে মানুষের কোন মূল্যই নেই। সেখানে রাষ্ট্র অথবা সরকারে থাকা কমিউনিষ্ট পার্টির সমালোচনা করা যায় না ব্যক্তির কোন নিরাপত্তা নেই। এসব কিছু তাদের ধারণা মত ব্যক্তিকে রক্ষা করে f¯^vgx ও পুজিবাদীদের থেকে। বস্তুত সাম্রাজ্যবাদ ও পুজিবাদ মানব মর্যাদা হানিকর। তবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, একনায়কতন্ত্র এটা শোষণের ক্ষেত্রে আরো ভয়াবহ।

পক্ষান্তরে ইসলাম প্রথম থেকেই মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সচেতন। ইসলাম মানুষকে সকল প্রকার বাতিল প্রভুর দাসত্ব থেকেমুক্ত করে। একমাত্র মাবুদের ইবাদত ও পবিত্রতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। অতএব কোন দাসত্ব নয় শাসন কর্তার, কর্তৃত্বের, সম্পদের, প্রভাব– খ্যাতির, বর্ণ বা শ্রেণীর অথবা যে সকল উপায় উপকরণে মানুষের দাসত্ব হতে পারে তার কোনটিই নয়।দাসত্ব শুধু একমাত্র আল্লাহর।

এ পর্যায় ইসলাম বিধান দাতার অধিকার মানুষ থেকে বের করে তার প্রকৃত মালিক আল্লাহর নিকট সমর্পন করে। কারণ মানুষ যদি বিধান তৈয়ার করে সেখানে মানুষের মধ্যে শ্রেণীতে বিভক্তির প্রয়োজন দেখা দেবে। কেউ হবে সাদাহ (বিধান দাতা) আবার কেউ হবে আবিদ (শাসিত) । আর যদি আল্লাহ হোন বিধান দাতা তাহলে সবাই আল্লাহর বান্দা এবং সবাই তারই বন্দেগী করেন এতে শাসক শাসিত ধনী–গরীব থাকবে সমান। কোন শ্রেণী বিভক্তি থাকবে না।

অতঃপর ইসলাম প্রবর্তন করে নিরাপত্তার তা শুধু জীবন ও সম্পদে নয় মানুষের ইজ্জতেরও নিরাপত্তা দেয় ইসলাম। এবং তা শুধু নৈতিক পর্যায় নয় বরং মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার ক্ষেত্রেও। তাই এখানে কেউ সীমা লজ্ঘন করে না; অপরকে কটাক্ষ করে, চোখের ইশারাতে উপহাস করে, পরনিন্দা করে অথবা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে।

ইসলাম তা বাস্তবে কার্যকরও করে। আমর বিন আস (রাঃ) এর ছেলে যখন কিবতী সমপ্রদায়ের এক যুবককে দৌড়ে তার আগে চলে যাওয়ার কারণে মারধর করল এবং বলল আমি নেতার ছেলে, যুবকের পিতা ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকট বিচার চাইলে ওমর রা. তার হাতে লাঠি দিয়ে বললেন: নেতার ছেলেকে তোমার হাতে প্রহার কর। অতঃপর আমর বিন আসকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে আমর! কবে থেকে মানুষকে দাস বানাতে শিখলে? অথচ তাদের মা তাদেরকে ¯^vaxb হিসাবে প্রসব করেছে ?

অধিকার ও দায়বদ্ধতা ছাড়াও ইসলামে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক রয়েছে।

এখানে আল্লাহর সন্তান (নাউজুবিল্লাহ) যীশু খৃষ্টের আগমন পূর্ব পর্যন্ত অপরাধ মানুষের গলায় ঝুলে থাকার মত কোন বিধান বলতে কিছু নেই। তিনি এসে শুলীতে নিজের জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে মানুষকে অপরাধ থেকে নিস্কৃতি দিবেন এমনও নয়।

বরং আদম আঃ তাওবা ও ক্ষমা তার প্রভুর কাছ থেকে সরাসরি লাভ করেন কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে।

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿البقرة:37﴾

অনন্তর আদম ¯^q প্রতিপালক হতে কতিপয় বাক্য শিক্ষা করলো আল্লাহ তখন তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল করুনাময়।

২। এখানে কোন পৌরহিত্যবাদ নেই, যারা মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে মধ্যস্থতা করবে, বরং এতে মানুষ সরাসরি তার প্রভুর কাছে যোগাযোগ করতে পারে ইবাদত, দুআ ও ক্ষমা প্রার্থণার মাধ্যমে।

৩। মানুষের কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তি দুনিয়াতে চলতে থাকে।

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الأنفال: 53)

কারণ এই যে, আল্লাহ কোন জাতির উপর নিয়ামত দান করে সেই নিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতি নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ألروم:41﴾

মানুষের কৃতকর্মের কারণে সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে তাদের কে কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি Av¯^v`b করান যাতে তারা ফিরে আসে।

অতএব মানুষেই তার গন্তব্য নির্ধারণ করবে কৃত আমলের মাধ্যমে

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿7﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿8﴾ الزلزلة: 7- 8

কেউ অনুপরিমাণ সৎকর্ম করলে তাও দেখবে এবং কেউ অনুপরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে।

يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا (رواه مسلم)

হে! আমার বান্দাগণ এ হলো তোমাদের কর্ম তা তোমাদেরকে যথাযথভাবে দিব। যে ভালো দেখবে সে যেন আল্লাহর প্রসংশা করে যে মন্দ দেখবে সে যেন নিজেকেই ভৎসনা করে।

৪। ইসলামি দর্শনে মানুষেই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ, বস্তু অথবা প্রকৃতি নয়। যেমনটি ইতিহাসের বস্তু তাত্বিক ব্যাখ্যায় বলা হয়। অতএব বিশ্ব জগত পুরোটাই আল্লাহর পক্ষ হতে মানবাধীন করা হয়েছে।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (الجاثية: 13)

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছুই নিজ অনুগ্রহে।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿الإسراء: 70﴾

আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি তাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং যাদের আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

৫) ইসলাম প্রচেষ্টা চালায় মানব মর্যাদা বিকাশের,মানুষের মনুষত্বগুলোর উন্নতির মাধ্যমে। তাই তাকে প্রতিপালন করে উচ্চতর মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিকৃষ্ট অহংকারের উর্ধ্বে উঠতে, উত্তীর্ণ হতে অপবিত্র কু-প্রবৃত্তি হতে ও জাগতিক ভোগের সামগ্রী হতে। এতে করে সে প্রকৃত মর্যাদাবান হবে, মুক্ত হবে পশুত্বের বন্ধন হতে। যোগ্য হবে তার উপর ফেরেস্তা অবতীর্ণ হওয়ার।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا (فصلت: 30)

নিশ্চয় যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্। অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয় এবং বলে তোমরা ভয় করোনা। চিন্তা করোনা।

৩) পরামর্শ ও ন্যায় বিচারের ভিত্তি স্থাপন

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (ألشورى: 38)

এবং পারস্পরিক পরামর্শক্রমে তারা কাজ সম্পাদন করে।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴿ألنساء:58﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানত সমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার মীমাংসা করতে আরম্ভ কর তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক।

ইসলাম রাজনীতির জন্য যে মূলনীতি পেশ করেছে তন্মধ্যে শুরা নীতি হলো অন্যতম তা ছাড়া শুরানীতি মানব মর্যাদার জন্য গুরুত্ব পূর্ণ।

ইউরোপ সংসদে প্রতিনিধিত্বের অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় রাজনীতি আলোচনায় সংসদের অধিকার প্রতিষ্ঠাকে রাজনীতির জগতে গণতন্ত্রের বিশাল বিজয় বলে মনে করে। এর দ্বারা সাধারণ নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলেও মনে করে।

ইউরোপ এ অধিকার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পৌঁছতে বহু শক্তি ক্ষয় করেছে অনেক রক্ত ঝরাতে হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দ্বীন, মানুষের এসব অধিকার সমূহ তাদের পক্ষ হতে চাওয়ার আগেই প্রথম থেকেই প্রদান করে এবং এর জন্য কোন শক্তিক্ষয় অথবা রক্ত ঝরাতে হয় না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের পরামর্শ চাইতেন যে সব বিষয়ে কোন অহী অবতীর্ণ হয়নি, এবং সঠিক মত গ্রহণ করতেন। যেমন বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের অবস্থান কি হবে সে বিষয় পরামর্শ চেয়েছেন। (আবু সুফিয়ানের কাফেলা মহানবীর পশ্চাদ্বাবনের সংবাদ জানতে পেরে নদীর তীর ধরে অতিক্রম করে চলে গেছে। আর কোরাইশ তাদের রক্ষণা-বেক্ষণে ও মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য, মক্কা থেকে এক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী এগিয়ে আসছে এ সংবাদে অবস্থার মোড় পাল্টে যায়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন আগত এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কিনা।) অথবা কোন একটি মতামত গ্রহণ করেছেন কিন্তু অহী সঠিক মতামতের পক্ষে সংশোধনী পেশ করেছে। যেমন বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে আবু কর রা. এর মতামত গৃহীত হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে ওমর এর মতামত সঠিক বলে অহীর মাধ্যমে জানানো হলো। অথবা কোন মতামত গ্রহণ করার পর পরিস্কার হলো, বিপরীত মত গ্রহণ সঠিক ছিল। যেমন উহুদ যুদ্ধের সময় যুবকদের পরামর্শে মদিনা হতে বের হওয়া শত্রুর অপেক্ষায় মদিনা অবস্থান না করা, যেমনটি প্রবীন সাহাবীগণ মতামত দিয়েছেন। যার ফলে উহুদ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য বাহিনী অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। এ উদাহরণ তিনটি প্রমাণ বহন করে ইসলামিক পদ্ধতিতে শুরার মৌলিকত্বের এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে ইসলামী

রাজনীতিতে শুরুর সু–দৃঢ় অবস্থানের। আল্লাহ অবশ্যই পারতেন বদর যুদ্ধে তারা কোন স্থানে অবস্থান করবেন সে সম্পর্কে অহী অবতীর্ণ করতে, সবকটি যুদ্ধতো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে। মুসলমানদের এতে কোন ভূমিকা এবং প্রস্তুতি ছিলনা।

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴿5﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿6﴾ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿7﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿8﴾ (الأنفال:5-8)

যে রূপে তোমার প্রতিপালক তোমাকে তোমার গৃহ হতে (বদরের দিকে) যথাযথভাবে বের করলেন আর মুসলমানদের একটি দল একে খুবই (অপছন্দ) মনে করেছিল। সেই যথার্থ বিষয় প্রকাশ হওয়ার পরেও তারা তোমার সাথে এরূপ বিবাদ করেছিল যেন কেউ তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর তারা তা প্রত্যক্ষ করছে। আর তোমরা সেই সময়টিকে ¯§iY কর যখন আল্লাহ তোমাদেরকে সেই দুই দলের মধ্য হতে একটি m¤‡Ü প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন যে, ওটা তোমাদের কলরতল গত হবে আর তোমরা এই অভিপ্রায়ে ছিলে যেন নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে এসে পড়ে, আর আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এই যে তিনি ¯^xq নির্দেশনাবলী দ্বারা সত্যকে সত্য রূপে প্রতিপন্ন করেছেন এবং সেই কাফিরদের মূলকে কর্তন করেছেন। যেন সত্যকে সত্যরূপে এবং অসত্যকে অসত্য রূপে প্রমাণিত করে দেন যদিও এটা অপরাধীরা অপ্রীতিকরই মনে করে।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের পরামর্শের উপর ছেড়ে দিলেন এ জাতীয় বিষয়ে শুরার ভীত রচনা করার জন্য।

যুদ্ধ বন্দী– বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মতামত গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল ভূল। যার প্রেক্ষিতে অহী অবতীর্ণ হয়েছিল।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿67﴾ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿68﴾ الأنفال: 67-68

কোন নবীর পক্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্দী লোক রাখা শোভা পায়না যতক্ষণ পর্যন্ত ভূ–পৃষ্ঠ (দেশ) হতে শত্রবাহিনী নির্মূল না হয়, তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করছো আর আল্লাহ চান পরকালের কল্যাণ আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। পূর্ব থেকেই জানতেন এই ঘটনা ঘটবে। কিন্তু আল্লাহ তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ ভূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অহীর মাধ্যমে নিষেধ করেননি। এবং এই ঘটনার পরও পরামর্শ পরিত্যাগের জন্য বলেননি। যাতে মুসলিম জীবনে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে উম্মতের রাজনৈতিক প্রাচীর নিমার্ণে পরামর্শ অন্যতম একটি মৌলিক বিষয়। যদিও বা কখনো ভূল মাতমত গ্রহণ হয়। মানুষ সবসময় ভূলে পতিত হয়; এবং পরামর্শ এককভাবে বিশুদ্ধতার উপরও সীমাবদ্ধ নয়। যে পরামর্শে ভূল হলে উম্মতকে দোষারুপ করা যাবে। উহুদের ঘটনায় বিষয়টি আরো পরিস্কার হয়। বিষয়টি এতে সীমাবদ্ধ থাকেনি যে, যে যুবকেরা শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদিনা হতে বাহির হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এবং তারা শুধু অধিকাংশের মতামত উপেক্ষা করেছিল যার প্রতি প্রবীণদেরও সমর্থন ছিল। বরং সৈন্য বাহিনীর একদল যুবক সরাসরি রাসূলের আদেশকেও অমান্য করলেন। যাদেরকে যে কোন অবস্থাতেই পাহাড়ের নির্ধারিত স্থান ছাড়তে নিষেধ করা হয়েছিল। যদিও মুসলমানের উপর তারা

দুর্যোগ আসতে দেখে। যার ফলে মুসলমাদের পরাজয় হওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষত বিক্ষত হওয়া, এবং কাফিরদের উল্লাস প্রকাশ করা হয়। এতো কিছুর পরো আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়–

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران: 159)

অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদের জন্য ক্ষমার প্রার্থনা কর এবং কার্য m¤‡Ü তাদের সাথে পরামর্শ কর।

এতে বুঝা যায় শুরা অবশ্যই পালনীয় যদিও কখনো অপ্রত্যাশিত ফলাফল প্রত্যক্ষ করতে হয়। ইসলাম এ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে, গুরুত্বারোপ করেছে, স্পষ্ট করেছে এর কল্যাণ আজ থেকে ১০০০ এক হাজার বছর পূর্বে যখন ইউরোপ এ সম্পর্কে কল্পনা করতেও শিখেনি।

ন্যায়-বিচারঃ এ বিষয় তো ইসলাম সবার শীর্ষে। ইসলাম ছাড়া অন্য কেহ আজও এর সঠিক ব্যবহার শিখেনি। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের এ বলে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿المائدة:8﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিধান সমূহ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠাকারী ও ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হয়ে যাও। কোন বিশেষ সমপ্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এর প্রতি উদ্যত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার করবেনা। তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম m¤‡Ü পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (النساء:135

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদান কারী, সুবিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এটা তোমাদের নিজের অথবা পিতা মাতা ও আত্মীয় ¯R‡bi বিরুদ্ধে হয়। বাস্তব জীবনে, এ সত্য কার্যকর হয়েছে। আমরা দেখেছি ওমর রা. কিবতী সমপ্রদায়ের ঐ ব্যক্তির সাথে কেমন আচরণ করেছে, যাকে আমর ইবনু আসের ছেলে প্রহার করেছিল। জনৈক কৃতদাস তাওয়াফ প্রক্কালে জাবালা ইবনু আইহামের পোষাকে পা দিলে জাবালা কৃতদাসের মুখে চপেটাঘাত করলো সে বিষয়টি ওমর রা.-এর নিকট উত্থাপন করলে ওমর রা. কেছাছের আদেশ দিলেন। এরপর জাবালা পালিয়ে গিয়ে ধর্মত্যাগ করল। কিন্তু এরপরও ওমর রা. ন্যায়প্রতিষ্ঠায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। আমিরুল মুমিনীন আলী রা.-এর বর্ম হারিয়ে গেলে তা একজন ইহুদীর কাছে পাওয়া গেল। আলী রা. প্রমাণ পেশ করতে অপারগ হওয়ায় কাজী বর্মটির রায় ইহুদীর পক্ষেই দিলেন।

এভাবেই ইসলাম বাস্তবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছে। ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নামে বুলি আউড়ানো নয়। পুরোমানব ইতিহাসে ন্যায় প্রতিষ্ঠার এরূপ কোন দৃষ্টান্ত কেউ দেখাতে পারবে? যা বলে তা বাস্তবায়ন করে? ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলা ও লেখার বিপরীতে? যদি উন্নত বিশ্বের ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা দেখতে চান; তাহলে আমেরিকায় বা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী চরিত্রের কারণে নির্যাতিতদের জিজ্ঞেস করুন অথবা পৃথিবীর যে কোন উপনিবেশ অঞ্চলের অধিবাসীদের জিজ্ঞেস করুন। অথবা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন কোন মামলার বাদী কে যদি সে হয় ঐ অঞ্চলের সংখ্যালঘু মুসলমান। অতঃপর দেখুন কুরআনের সিদ্ধান্তের দিকে।

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿التوبة:10﴾

তারা মর্যাদা দেয়না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার আর না অঙ্গীকারের। আর তারাই সীমালংঘনকারী।

মুজিযাঃ

মাজিযা একটি অতি প্রাকৃত বিষয় যা আল্লাহর প্রেরিত নবীগণ নিয়ে আসেন, এবং মানুষকে এর প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানান। মানুষ অনুরূপ বস্তু আনায়নে অপারগ হয়, এবং এটা প্রমাণ হয় যে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য নবী; নবুয়াতের দাবী নিজের পক্ষ হতে নয়।

এ মুজিযা কয়েক প্রকার :

১) বাহ্যিক ও বোধশক্তি m¤Ü¤q যেমন– চন্দ্র খন্ডিত করা, সমুদ্র বিদীর্ণ হওয়া মূসা এবং তার কাউমের সামনে হাত থেকে আলো বের হওয়া, লাঠি, সর্প হওয়া ইত্যাদি।

২) জ্ঞান সম্পর্কীয় যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বেকার নবীদের সম্পর্কে খবর দেয়া, যা আহলে কিতাবের নিকট সংরক্ষিত কিতাবের সংবাদের সাথে মিলে যেত। অথচ তিনি তাদের নিকট থেকে তা শিখেননি।

৩) গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে সংবাদ প্রদান যেমন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোম– পারস্যের ধ্বংসের সংবাদ দিয়েছিলেন।

প্রত্যেক নবী ঐ ধরণের মুজিযা নিয়েই আগমন করেন যা তার জাতির কাছে প্রসিদ্ধ। যাতে চ্যালেঞ্জটা হৃদয় স্পর্শ করে এবং তার কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়। মিসরীয়রা যাদু বিদ্যায় বুৎপত্তি অর্জন করেছিল এবং ফিরাউনী মন্দিরের পৌরহিতগণ ছিলো এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষ, তারা যাদুর সাহায্য নিতো যাতে মানুষকে হতবুদ্ধি করা যায়, ফিরাউন এবং কাল্পনীক প্রভূদের দাস বানানো যায়। যাদের আরাধনা করত ঐসব পৌরহিত অথবা যাদুকরগণ এবং ওদের নামে জনগণ থেকে নজরানা ও সম্পদ লুণ্ঠন করতো।

এ জন্য আল্লাহ মুসা আ. কে ঐ ধরনের মুজিযা দিয়ে প্রেরণ করেছেন যা ঐ সব যাদুকরদের কাছে পরিচিত যাতে তাদের যাদু ধ্বংস হয় এবং আল্লাহর সৃষ্টি ও মানুষের সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য হয়।

وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿104﴾ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿105﴾ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿106﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿107﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿108﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿109﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿110﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿111﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿112﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿113﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿114﴾ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿115﴾ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿116﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿117﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿118﴾ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴿119﴾ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿120﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿121﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿122﴾ الأعراف: 104-122

আর মূসা বললেন– হে ফিরাউন আমি বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত রাসূল। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়। আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলদেরকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও। সে বলল, যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক তাহলে তা উপস্থিত কর যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। তখন তিনি নিক্ষেপ করলেন নিজের লাঠি খানা এবং তৎক্ষনাৎ তা জল জ্যান্ত এক অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আর বের করলেন নিজের হাত এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধব ধবে উজ্জল দেখাতে লাগল। ফেরাউনের সাঙ্গ–পাঙ্গরা বলতে লাগল, নিশ্চয় লোকটি বিজ্ঞ যাদুকর। সে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এ ব্যাপারে তোমাদের কি মত? তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দান করুন এবং শহর বন্দরে লোক পাঠিয়ে দিন লোকদের সমবেত করার জন্য যাতে তারা পরাকাষ্ঠা সম্পুন্ন বিজ্ঞ যাদুকরদের এতে সমবেত করে। বস্তুতঃ যাদুকররা এসে ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হল। তারা বলল আমাদের জন্য কি কোন পারিশ্রমিক নির্ধারিত আছে যদি আমরা জয় লাভ করি? সে বলল হ্যাঁ। এবং অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোক হয়ে যাবে। তারা বলল হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা আমরা নিক্ষেপ করছি। তিনি বললেন তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন লোকদের চোখগুলোকে ধাঁধিয়ে দিল ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং মহা যাদু প্রদর্শন করল। তারপর আমি অহীযোগে মূসাকে বললাম এবার নিক্ষেপ কর তোমার লাঠিখানা। অতএব, সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তারা বানিয়েছিল যাদু বলে। সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য বিষয় এবং ভূল–প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা করছিল। সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল এবং যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। বলল আমরা ঈমান আনছি মহা বিশ্বের প্রতিপালকের প্রতি। যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।যাদুকরগণ যাদুর আসল রহস্য জানতো এজন্য প্রথমেই তাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে মূসা আ. যা করলেন এটা যাদু নয় এটা মানব সাধ্যের উর্দ্ধে কাজ, যদিও তাদের ও মূসা আ. এর কাজের বাহ্যিক অবস্থা একই রকম ছিল। এজন্য তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। মূসা আ. আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল হওয়ার ¯^xKvi Kij|

এমনিভাবে ঈসা আলাইসি সালামকে প্রেরণ করলেন এমন জাতির নিকট যারা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শি ছিল। তারা এমন অভূতপূর্ব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতো যে মানুষের চক্ষুতে ধাঁধা লেগে যেত। যুক্তি যুক্ত ছিল যে ঈসা আ. যে, মুজিযা নিয়ে প্রেরিত হবেন তা এ ক্ষেত্রে আরো অলৌকিক হবে যাতে প্রথমে চিকিৎসকদের নিকট এবং তাদের মাধ্যমে সাধারণের নিকট পরিস্কার হয়, যে এ মুজিযা তারা যা করছে তার চেয়ে উন্নত কোন বস্তু। যে বস্তু তাদের অপারগতা করে দেয় এ বিষয় তাদের পারদর্শিতার পরও। অতএব এর জন্য প্রয়োজন ছিল এমন উৎস থেকে সে বস্তুটি আগমন হওয়া যা মানবীয় গন্ডির বাহিরে। অর্থাৎ সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হতে। এ জন্য দেখা যায় তার মুজিযা ছিল কুষ্ঠ ও অন্ধরোগীকে মূহুর্তে তাদের সামনে বিনা ঔষধ ও চিকিৎসায় সুস্থ্য করে ফেলা। এটা ছিল মানব সাধ্যাতীত। এর পর তার মুজিযার পরিধি আরো বৃদ্ধি হলো মৃতকে জীবিত করা। তারা তো কোন না কোনো মাধ্যম Aej¤^b করে কুষ্ঠ ও অন্ধ রোগীর চিকিৎসা করতো। কিন্তু মৃতকে জীবিত করা তাদের সাধ্যের বাহিরে ছিল। এটা আল্লাহ অথবা তার পক্ষ থেকে প্রেরিত কোন মানুষের মুজিযা দ্বারা সম্ভব ছিল।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রেরণ করেছেন আরব জাতির নিকট তারা ছিল সুভাষী ও ভাষা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্ধী। ভাষা নিয়ে হতো প্রতিযোগীতা, করতো অহংকার ভাষা নিয়ে, এমনকি তারা অন্যদের আজমী বলে আখ্যা দিতো। অর্থাৎ যাদের ভাষা অস্পষ্ট তারা ঐ ব্যক্তির সাথে তুল্য যে কথা বলতে পারেনা। এজন্য যুক্তি যুক্ত ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুজিযা হবে ভাষা সাহিত্যে

মুজিযা। ঐ মানের যে মানে তারা বুৎপত্তি অর্জন করেছিল। যাতে তারা অনুমান করতে পারে যে এটা মানব শক্তি সামর্থের উর্দ্ধে এবং ¯^xKvi করে নেয় যে এটা অবশ্যই আল্লাহ প্রদত্ত।

কুরআনের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের মুশরিকদের নিকট প্রেরিত হওয়ার শুরুতেই তারা তাকে মিথ্যারোপ করলো। আল্লাহর রীতিনুযায়ী সকল রাসূলদের শুরুকালটা এমনি হয়। কারণ সকল জাহিলি যুগেই নেতৃবৃন্দের পক্ষে কখনোই সম্ভব হয়না। "লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ" আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। এই বাক্যের কাছে আত্মসমর্পন করা। যার অর্থ দাঁড়ায় তাদের কাছে কুক্ষিগত সকল ক্ষমতা যা প্রয়োগ করে তারা মানুষের উপর বড়ত্ব জাহির করতো। প্রকৃত উপাসনা আল্লাহকে প্রত্যার্পণ করা। উপাস্য হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর ভৃত্য হওয়াতে সন্তুষ্ট হওয়া। তারা যে মিথ্যা প্রতিপালকের দাবী করতো তা হতে ফিরে আসা। হালাল-হারামের বিধান দাতার দাবী থেকে সরে আসা। যা হতো বানোয়াট উপাস্যের ছত্র ছায়ায়। ভৃত্য- সমপ্রদায় তারাও খুব সহজে لاإله إلا الله এর আহ্বানে সাড়া দিতোনা। কারণ এটা ছিল তাদের পরিচিত নিয়মের বিরোধী এবং তারা প্রভূ শ্রেণী কে ভয় করতো। ভেজাল প্রভূদের কর্মকাণ্ড তাদের ভিতর প্রভু ভীতির জন্ম দিয়েছিল। অন্য কারণ হলো তারা কু-প্রবৃত্তিতে ডুবে ছিল।

যখনই তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাবাদী বলতো অবশ্যই তারা বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে পড়তো। রাসূল যে সু উচ্চ ভাষায় কথা বলতো সে ভাষা অলংকারের রহস্য উদঘাটন করার এবং এটা যে আল্লাহ প্রদত্ব ঐশী কালাম সে ¯^xKwZ দেয়ার। অথবা সাধারণ মানুষের মুখামুখী হওয়ার। কারণ তারা গ্রহণ যোগ্য উত্তর নেতৃবৃন্দের থেকে না ফেলে তাদের আনুগত্য A¯^xKvi করবে। মানে কোরাইশ নেতৃত্বের পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে। এতে তাদের ক্ষমতা খর্ব হবে, যে ক্ষমতা তাদের সকল দাম্ভিকতার মূলে কাজ করছে। ফলে সঠিক উত্তর এড়িয়ে তারা বললো: নিশ্চয় সে হলো যাদুকর, গনক, পাগল, জ্বীন তার কাছে বিভিন্ন বিষয় পৌছায় এবং সে তা বলে বেড়ায়।

তারা মিথ্যাবদী এটা তারা খুব ভালো করেই জানতো। প্রমান ¯^i/c একটি ঘটনা। ওয়ালীদ ইবনে মগীরাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কুরআন শ্রবন করে তার কাউম বনী মাখজুম কে বললো

والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى.

আল্লাহর শপথ একটু আগে মুহাম্মদের নিকট এমন কিছু কথা শুনেছি যা, না কোন মানুষের কথা, না কনো জ্বীনের কথা তার কথায় রযেছে মাধুর্যতা, রয়েছে কমনীয়তা তার বাহ্যিক আবরণ হৃদয়গ্রাহী এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবাহিত রয়েছে এক স্নিগ্ধ ফলগুধারা এটা নিশ্চয়ই সবার উর্দ্ধে থাকবে এবং তার উপর কেউ প্রবল হতে পারবেনা। তার এ বক্তব্য যখন কোরাইশ ব্যক্তিবর্গ শুনলো তারা বললো ওলীদ মুহাম্মদের ধর্মে ঝুঁকে পড়েছে। এতে করে নিশ্চয় পুরো কোরাইশ মুহাম্মদের আদর্শে ঝুঁকে যাবে। অতঃপর আবু জাহিল বললো! তার সাথে ব্যাপারটা আমি দেখছি। আবু জাহিল তার নিকট গিয়ে মন্ত্রের মত তার সাথে আলাপ সেরে তাকে তপ্ত করে ফেলে। এরপর ওলীদ ফিরে এসে কোরাইশদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বললোঃ আপনাদের ধারণা মুহাম্মদ পাগল তাকে কি দিশেহারা হতে দেখেছেন? আপনারা বলেন সে গনক ভবিষ্যদ্বক্তা তাকে কি গণনা করতে, ভবিষ্যদ্বানী করতে দেখেছেন? আপনারা মনে করেন সে একজন কবি তাকে কি দেখেছেন কখনো কবিতা চর্চা করতে? আপনারা মনে করেন সে মিথ্যাবাদী তার মাঝে মিথ্যার লেশ মাত্র থাকার অভিজ্ঞতা কি কারো কাছে আছে? প্রতিবারেই তাদের প্রশ্ন করলেন তারা সকলে প্রতিবারেই উত্তরে বললো " لا اَللّٰهُمَّ0 না আমরা এসব দেখেনি। সকলে বললো তাহলে তাকে আমরা কি

বলবো? ওয়ালীদ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললঃ আমরা তাকে যাদুকর বলবো, তোমরা কি লক্ষ্য করোনি সে পৃথক করে ব্যক্তি ও তার পরিবার, সন্তান ও তার অভিভাবকের মাঝে? এ ঘটনাটি মহাগ্রন্থ আল–কোরআনে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন এভাবে–

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿11﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿12﴾وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿13﴾ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿14﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿15﴾ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿16﴾ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿17﴾ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿18﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿19﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿20﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿21﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿22﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿23﴾ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿24﴾ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿25﴾ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿26﴾ (المدثر: 11–26)

যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি, তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি তাকে বিপুল ধন–সম্পদ দিয়েছি এবং সদা সংগী পুত্রবর্গ দিয়েছি এবং তাকে খুব সচ্ছলতা দিয়েছি এরপরও সে আশা করে যে, আমি তাকে আরো বেশী দেই। কখনই নয়। সে আমার নিদর্শন সমূহের বিরুদ্ধাচরণ কারী। আমি সত্বরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহন করাব। সে চিন্তা করেছে এবং মনঃস্থির করেছে। ধ্বংস হোক সে কি রূপে সে মনঃস্থির করেছে আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনঃস্থির করেছে। সে আবার দৃষ্টিপাত করেছে, অতঃপর সে ভ্রুকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে ও অহংকার করেছে। এরপর বলেছে এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ নয়। এতো মানুষের উক্তি বৈ নয়। আমি তাকে দাখিল করব অগ্নিতে।

এখানে শেষ নয়, জাযিরাতুল আরব জুড়ে এ সব মিথ্যা কথা গুলো তারা প্রচার করলো যাতে মানুষের মধ্যে কুরআনুল কারিমের প্রভাব সৃষ্টিতে অন্তরায় হয়। এ জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান করেছেন এ কুরআনের মত একটি কিতাব প্রদর্শন করে।

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿الإسراء:88﴾

বলুন যদি মানব ও জ্বীন এই কেরাআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয় তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবেনা।

এ চ্যালেঞ্জ দীর্ঘ বছর পর্যন্ত বহাল ছিল। তারা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করে তবুও তারা ইসলাম গ্রহণে সম্মত হয়নি। এজন্য চ্যালেঞ্জ এর ধরন পরিবর্তন করা হয়।

বলা হয়–

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿هود:13﴾

তারা কি বলে? কোরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল তবে তোমরা ও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে। চ্যালেঞ্জ এর বিষয় পরিমাণ কমিয়ে দেয়া অবশ্যই চ্যালেঞ্জ কে শক্তিশালী করা উদ্দেশ্য, কারণ পরিমাণে কম যদি তারা উপস্থিত করতে না পারে নিশ্চিত বেশির উপস্থিত অবশ্যই তাদের পক্ষে অসম্ভব। বাস্তবে হয়েছেও তাই। কিন্তু তারা অহংকার, বিদ্বেষ করেই চললো এ জন্য চ্যালেঞ্জ আরো শক্তিশালী করা হলো এবং বলা হলো

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿يونس:38﴾

মানুষকি বলে যে এটি বানিয়ে এনেছ? বলে দাও তোমরা নিয়ে এসো একটিই সূরা আর ডেকে নাও, যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

এরপরও তারা যখন তাদের দম্ভ অহংকারের পুনরাবৃত্তি ঘটাল তাদের উদ্দেশ্যে বলা হলো।

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿23﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿البقرة:24﴾

এতদ সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি তাহলে এরমত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও। এক আল্লাহকে ছাড়া যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি তা না পার অবশ্য তা তোমরা কখনো পারবেনা। তাহলে সে দোযখের আগুণ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।

আজও সে চ্যালেঞ্জ বহাল আছে, কাল পরিক্রমায় চৌদ্দশত বছর পার হয়ে গেলো অপারগ হলো আরবের ভাষাবিদ সাহিত্যিক সহ তাবৎ দুনিয়ার সকল মানুষ। নিঃসন্দেহে কিয়ামত পর্যন্ত তারা অক্ষমতাই প্রকাশ করবে।

সকল রাসূলের মুজিযা ছিল বাহ্যিক ও মহাজগত সম্পর্কিত যা ছিল প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সম্পর্কিত।

নূহ আ. এর মুজিযা ছিল ভয়াবহ তুফান– বন্যা। যাতে মিথ্যাবাদীরা নিমজ্জিত হতো আর ঈমানদারগণ নিরাপদ থাকতো।

হুদ আ. এর মুজিযা ছিল প্রলয়ংকারী বাতাস। এতে মিথ্যাবাদীরা নিপাত যেতো আর সত্যবাদীগণ মুক্ত পেত।

সালেহ আ. এর মুজিযা ছিল ভয়াবহ ভূমিকম্প। যার মাধ্যমে তাদেরকে তাদের গৃহের মধ্যে মৃত্যুর ¯^v` নিতে হয়েছিল। যখন তার কাউম আল্লাহ কর্তৃক নিদর্শন ¯^iƒc প্রেরিত উষ্ট্রীকে বধ করলো। লুত আ. এর মুজিযা ছিল আগুন যা আকাশ থেকে প্রেরণ করা হতো। এতে পাপী ব্যক্তিরা ধ্বংস হলো এবং লুত আ. এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কারীগণ রক্ষা পেলেন। এমনিভাবে মূসা ঈসা আ. এর মুজিযা ও ছিল জাগতিক সম্পর্কিত অলৌকিক পূর্ণ। যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজিযা মূলত আত্মিক ও জ্ঞানের mgšq ছিল। বাহ্যিক ও জাগতিক এর mgšq ছিলনা। যদি ও রাসূল স. এর কতিপয় মুজিযা বাহ্যিক ও মহা জাগতিক ছিল। যেমন ইসরা, মেরাজ, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করণ। বড় মুজিযা যাকে দিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং যা যুগের পর যুগ অবশিষ্ট আছে এবং যার মাধ্যমে পুরো মানবজাতিকে m‡¤^vab করা হয়েছিল। তা হলো কুরআন। কুরআনকে বিশেষভাবে চয়ন করা হয়েছে সুরক্ষার এবং বিকৃতি সাধন থেকে হিফাজতের। এ নিশ্চয়তা আসমানী অন্যান্য কিতাবের ক্ষেত্রে ছিল না। কারণ এটা হলো আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন এবং আল্লাহ নিজে এর দায়িত্ব নিয়েছেন।

إنا نحن نزلنا الزكر وأنا له لحافظون (الحجر:9)

নিশ্চয় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার সুরক্ষাকারী।[1]

[1] ûnRi, 9|

এ জন্য এর সংরক্ষণের দায়িত্ব এমন এক শক্তিশালী জাতির কাঁধে অর্পন করা হয়েছে যাদের সংরক্ষণের পদ্ধতি ছিল নজির বিহীন। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের জন্য পৃথিবীর বুকে সু-শাসন, স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার একটি সু-সময় এসেছিল, যে সময়টুকু কুরআন সংকলন করার জন্য যথেষ্ট ছিল। রাসূলের নিকট পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে, বক্ষে সংরক্ষণ, আবার রাসূল স. ¯qs জিব্রাইলের নিকট পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে সংরক্ষণ তো আছেই। এভাবে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কুরআন সংরক্ষণের সকল ব্যবস্থাপনা প্রস্তুত ছিল। যার ফলে আল্লাহর ইচ্ছায় যুগ যুগ ধরে কুরআন অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে।

রাসূলের যুগে আল কুরআনে অলৌকিকতার ক্ষেত্র সমূহ

কুরআন সকল দিক থেকেই অলৌকিক। যদিও আরবের সাহিত্যিক ভাষাবিদদের চ্যালেঞ্জ করার কারণে কুরআনের ভাষাগত মুজিযা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মূলত কুরআন বিষয় বস্তু নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ভাষার মত সমান ভাবে অলৌকিক।

সমাপ্ত